

ডায়ালগ প্রতিবেদন-দুই

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশের কৃষি

কৃষি প্রতিবেশ রক্ষায় করণীয় নির্ধারণ



রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ

RESEARCH
INITIATIVES
BANGLADESH



ডায়ালগ প্রতিবেদন-দুই

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশের কৃষি
কৃষি প্রতিবেশ রক্ষায় করণীয় নির্ধারণ

সম্পাদনা

সুরাইয়া বেগম

সাইদুর রহমান

মোঃ ইফতেখার আলী



রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ



জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশের কৃষি
কৃষি প্রতিবেশ রক্ষায় করণীয় নির্ধারণ

Climate Change and Agriculture in Bangladesh:
Future of our agro-ecology

সম্পাদনায়

সুরাইয়া বেগম, সাইদুর রহমান, ও মোঃ ইফতেখার আলী

Edited by

Suraiya Begum, Saidur Rahman, and Md. Iftakhar Ali

প্রকাশকাল

নভেম্বর ২০১৮

Published in

November 2018

প্রকাশনায়

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)
বাড়ি ০৭ (কাজলী), সড়ক ১৭, ব্লক সি, বনানী
ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮০-২) ৯৮২০০৫১-২
ইমেইল: rib@citech-bd.com
ওয়েব: www.rib-bangladesh.org

Published by

Research Initiatives, Bangladesh (RIB)

House 07 (Kajoli), Road 17, Block C, Banani
Dhaka-1213, Bangladesh
Phone: (+ 880-2) 9820051-2
E-mail: rib@citech-bd.com
Website: www.rib-bangladesh.org

সহায়তায়

রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং
ফ্রাঞ্জ-মেহরিং-প্লাটজ্ ১
১০২৪৩, বার্লিন, জার্মানী
Website: www.rosalux.de
www.rosalux-southasia.org

Supported by

Rosa Luxemburg Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin, Germany
Website: www.rosalux.de
Web: www.rosalux-southasia.org

মুদ্রণে

ইউনিট্রেড কর্পোরেশন
মুক্তবাংলা শপিং কমপ্লেক্স
মিরপুর-১, ঢাকা

Printed by

Unitrade Corporation
Mukto Bangla Shopping Complex
8th Floor, Mirpur-1, Dhaka, Bangladesh

Sponsored by the Rosa Luxemburg Stiftung e.V with funds of the Federal Ministry for
Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany.

মুখবন্ধ	০৫
ভূমিকা	০৭
প্রথম দিন: ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮	
প্রথম সেশন: জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশের কৃষি	
উদ্বোধন ও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন	০৮
মুক্ত আলোচনা	০৮
নির্ধারিত আলোচকদের বক্তব্য	১৩
সভাপ্রধানের বক্তব্য	২৭
দ্বিতীয় সেশন: জলবায়ুর পরিবর্তন ও কৃষি নিয়ে সংশ্লিষ্ট	
প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির ধারণা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, বাধাসমূহ	
এবং সেসব বাধা উত্তরণে গ্রহীত পদক্ষেপসমূহ	২৯
বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের বিষয় ভিত্তিক বক্তব্য প্রদান	
সভাপ্রধানের বক্তব্য	৩৯
দ্বিতীয় দিন: ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮	৩৯
তৃতীয় সেশন: বাংলাদেশের জলবায়ু ও কৃষি: ভবিষ্যৎ রূপরেখা	
ও করণীয়	৩৯
নির্ধারিত আলোচকদের বক্তব্য	
সভাপ্রধানের বক্তব্য ও সমাপ্তি	৫৩

মুখবন্ধ

আমাদের কৃষক হাজার বছর ধরে শ্রম দিয়ে নানা ধরনের খাদ্যশস্য উৎপাদন করে আসছেন এবং যাবতীয় প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করে দক্ষ ফসল উৎপাদন ও বীজ সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। আমরা জানি, মানুষের জীবনধারণ প্রতিবেশ ব্যবস্থা তথা জীববৈচিত্র্য, জলাধার, ও বনাঞ্চল প্রভৃতির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। হাজারো প্রকারের প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক আমাদের প্রতিবেশ ব্যবস্থায় বিদ্যমান। এর কোন একটা স্তরে আকস্মিক পরিবর্তন দেখা দিলে তার প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী হবে সেটা সহজে নিরূপণ করা যায় না। শত শত বছর ধরে কৃষকরা, প্রতিবেশ ব্যবস্থার নিরীখে ফসল ও তার জাত নির্বাচন, চাষপদ্ধতি, সেচপদ্ধতি, ফসল উত্তোলন, বীজ সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছেন এবং আকস্মিক দুর্যোগ ও নানা উপায়ে তারা মোকাবেলা করে আসছেন।



এতসব সত্ত্বেও আমরা কি কৃষকের জ্ঞান ও দূরদর্শিতার সঠিক কদর করি। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে কৃষকের ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও উৎপাদন ব্যবস্থার বিপরীতে অধিক উৎপাদন-সহায়ক কৃষিপদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। তবে সেসব তথাকথিত বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও কৃষি প্রতিবেশ যে যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে-পানি দূষিত হয়েছে, মাটি নষ্ট হয়েছে, এবং খাদ্যে বিষক্রিয়া দেখা দিয়েছে, তা সবাই স্বীকার করবেন। যদিও সবুজ বিপ্লবের হাত ধরে খাদ্যের উৎপাদন বেড়েছে, তবুও ক্ষুধা-অপুষ্টি কমেনি। খাদ্যের মান নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। অর্থাৎ, উন্নয়ন স্থায়ী ও সুস্থ হচ্ছে না। বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে, বাজার ও কর্পোরেশন জনগণের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ চিন্তা করছে না।

বিভিন্ন দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এতে পরিবেশের উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ও মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন কৃষিকে যখন নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে, তখন দেখা যাচ্ছে, এই পরিবর্তনের সূত্রধরে বিভিন্ন মহল কৃষি ও প্রকৃতিকে ঘিরে নতুন নতুন ব্যবসায়ের পরিকল্পনা করছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ুর পরিবর্তনে উন্নত বিশ্বের শিল্পকারখানা থেকে উদ্গত গ্রিনহাউজ গ্যাস বিশেষভাবে দায়ী, অথচ তার খেসারত দিতে হচ্ছে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রকে।

পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রেক্ষিতে কৃষিব্যবস্থাকে উপযুক্ত ও শক্তিশালী রাখতে সরকার, গবেষক ও কৃষকদের সমন্বিতভাবে কাজ করা দরকার। এক্ষেত্রে স্থানীয় থেকে বৈশ্বিক, সর্বস্তরে জলবায়ুসহিষ্ণু কৃষিব্যবস্থা গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যদিও জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও ফসলী জমির পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণে অধিক ফসল উৎপাদন যুগের চাহিদা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবুও আমাদের মনে রাখা দরকার যে অধিক ফসল উৎপাদন করতে গিয়ে এমন কোন ব্যবস্থা নেওয়া ঠিক হবে না, যাতে প্রতিবেশ ব্যবস্থা, তথা প্রকৃতির ভারসাম্য, হুমকির মধ্যে পড়ে এবং প্রকান্তরে মানুষের জীবনধারণও অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেই সাথে, কৃষির নিয়ন্ত্রণ যাতে উৎপাদক কৃষকের হাতেই থাকে, সে ব্যাপারে আমাদের তৎপর থাকতে হবে।

রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং-জার্মানির সহযোগিতায় “জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশের কৃষি” বিষয়ক যে ডায়ালগের আয়োজন করা হয়েছিল তার মাধ্যমে কৃষি, কৃষক ও প্রকৃতিকে নিয়ে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার বিনিময় হয়েছে। কৃষি ও কৃষকের জন্যে কিভাবে ভারসাম্যপূর্ণ নীতি প্রণয়ন করা যায় সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, উদ্যোগী বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সরকারি কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ও আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ তাদের সুচিন্তিত মতামত ও সুপারিশ দিয়েছেন। এর ফলস্বরূপ আমাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং কৃষক ও কৃষিপ্রতিবেশ নিয়ে কাজের ক্ষেত্রে উদ্যম বেড়েছে। বিশেষজ্ঞদের যুক্তি-তর্ক ও পরামর্শ আমাদের করণীয় নির্ধারণকে সহজ করেছে।

সর্বশেষে বলতে হয়, আমরা যে কৃষি ও মাটিকে চিনতাম সেগুলোর ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। চাহিদা, প্রযুক্তি ও নানামুখী স্বার্থ এসব পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। তবে, কিছু কিছু পরিবর্তন যে স্বাস্থ্যকর নয় সে ব্যাপারে অনেক মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছি। উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আমাদের প্রিয় পরিবেশ ও প্রকৃতিকে বাঁচাতে হবে।

ড. শামসুল বারি

চেয়ারম্যান

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)



বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষকদের নিয়ে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় রিইব ২০১৩ সন থেকে কৃষি প্রশ্ন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ভূমি ব্যবহার ও কৃষির কৌশলপত্র এবং বর্তমানে “প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞানভিত্তিক কৃষি-প্রতিবেশ: শিক্ষণ ও গণগবেষণা ২০১৮” (Agro-ecology from Below: Pedagogy and Participatory Action 2018) নামে দুই বছরব্যাপী একটি কৃষিকেন্দ্রিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় যেসকল কাজ করা হয়ে থাকে তার মধ্যে উল্লেখ্য বিভিন্ন জেলায় স্থানীয় কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থ, মাটি-পানি-জীবন তথা জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, স্থানীয় খাদ্য ব্যবস্থা ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব নিয়ে আলোচনা-পরামর্শ ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, জ্ঞানচর্চা এবং একশনভিত্তিক কাজ করা। প্রকল্পের সম্প্রসারিত কর্মকাণ্ড হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি নিয়ে ২০১৭ সনের আগস্ট মাসে ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়, যেখানে ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞগণ জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষিতে তার প্রভাব, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে নানান মহলের চিন্তা ও নীতি, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বার্থ এবং কৃষি ও কৃষকের ভবিষ্যত নিয়ে সুচিন্তিত মতামত দেন ও তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেন। উক্ত সেমিনারের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে প্রাথমিকভাবে জ্ঞানের আদান-প্রদান হয়। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, আকর্ষণীয় ও জরুরী বিধায় এই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে কৃষি, জলবায়ু, পানি, ভূমি, বন, পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদসহ সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবর্গ, শিক্ষক ও গবেষক সমন্বয়ে “জলবায়ুর পরিবর্তন ও বাংলাদেশের কৃষি” শীর্ষক একটি সংলাপের আয়োজন করা হয় রিইব-এর পক্ষ থেকে। এই সংলাপে কৃষির চিরায়ত বৈশিষ্ট্য, জলবায়ুর পরিবর্তন ও অভিযোজন, প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষায় আমাদের করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়।

প্রথম দিন : ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮

প্রথম সেশন

উদ্বোধন ও শুভেচ্ছা বক্তব্য

ডায়ালগের প্রথম দিনের প্রথম সেশনে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম. এম. আকাশ। সেশনের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন রিইব এর উপ-পরিচালক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী সুরাইয়া বেগম। তিনি বলেন, রিইব ২০১৩ সন থেকে জার্মানীর



এম এম আকাশ



সুরাইয়া বেগম

রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং (আরএলএস)- এর সহায়তায় কৃষি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এই কাজের প্রথম পর্যায়ে রিইব ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের চ্যালেঞ্জসমূহ অনুসন্ধান ও কৃষির কৌশলপত্র নিয়ে কাজ করেছে। পরবর্তীতে দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ উত্তরণে এগ্রো-ইকোলজি নিয়ে কৃষকদের সাথে কাজ করছে। আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে কৃষির সম্পর্ক ও করণীয়।

সূচনা বক্তব্য শেষে সভাপ্রধান অংশগ্রহণকারীদেরকে নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করার অনুরোধ করেন। পরিচয় পর্ব শেষে রিইব-এর কনসালটেন্ট মো. সাইদুর রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। মূল প্রবন্ধটি ছবছ এখানে উপস্থাপন করা হলো।

মূল প্রবন্ধ:

জলবায়ু পরিবর্তন ও আমাদের কৃষি: কৃষি প্রতিবেশ রক্ষায় পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়

সাইদুর রহমান

ভূমিকা:

বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষকদের নিয়ে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় রিইব ২০১৩ সন থেকে কৃষি প্রশ্ন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ভূমি ব্যবহার এবং বর্তমানে “প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞানভিত্তিক কৃষি-প্রতিবেশ: শিক্ষণ ও গণগবেষণা ২০১৮” (Agro-ecology from Below: Pedagogy and Participatory Action 2018) নামে একটি কৃষি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।



সাইদুর রহমান



প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন জেলায় স্থানীয় কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থ, মাটি-পানি-জীবন তথা জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ এবং স্থানীয় খাদ্য ব্যবস্থা ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব নিয়ে আলোচনা-পরামর্শ ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং জ্ঞানচর্চা করা হয়। প্রকল্পের সম্প্রসারিত কর্মকাণ্ড হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি নিয়ে ২০১৭ সনের আগস্ট মাসে ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়, যেখানে ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞগণ জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষিতে তার প্রভাব, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে নানান মহলের চিন্তা ও নীতি, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বার্থ, এবং কৃষি ও কৃষকের ভবিষ্যত নিয়ে সুচিন্তিত মত দেন ও তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেন। উক্ত সেমিনারের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে প্রাথমিকভাবে জ্ঞানের আদান-প্রদান হয়। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, আকর্ষণীয় ও জরুরী বিধায় এ বছরের জুলাই মাসে কৃষি, জলবায়ু, পানি, ভূমি, বন, পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদ প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি ডায়ালগের আয়োজন করা হয়। উক্ত ডায়ালগে কৃষির চিরায়ত বৈশিষ্ট্য, জলবায়ুর পরিবর্তন ও অভিযোজন, প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষায় আমাদের করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। একই সেমিনারের সূত্র ধরে বেসরকারি পর্যায়ে যারা কৃষি ও কৃষকদের নিয়ে কাজ করছেন তাদের মধ্যে পারস্পরিক জানাশোনা বাড়ানো, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সংলাপের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নিচে সংক্ষেপে সংলাপের বিষয়বস্তু তুলে ধরা হলো।

কৃষিতে বিবর্তন ও নানাবিধ সংকট

প্রকৃতি ও মাটির জৈব শক্তি নির্ভর কৃষি বাংলাদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক খাদ্যচক্র, বাস্তুসংস্থান, জীববৈচিত্র্য তথা প্রতিবেশ ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। হাজার হাজার বছর ধরে এখানকার মাটি, প্রকৃতি, পানি, জলবায়ুর সাথে তাল রেখেই বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং ফসলের উদ্ভব ঘটেছিল। আর এসব ফসল ছিল পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। বিগত কয়েক দশকে অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন করতে গিয়ে কৃষিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হয়। স্থানীয় জাতের বিভিন্ন ফসলের বিপরীতে উচ্চ ফলনশীল, হাইব্রিডসহ বিদেশী ফসলের জাতের প্রচলন ঘটে। মানসম্পন্ন খাদ্য শস্যের জায়গায় অর্থকরী ফসলের দিকে বেশি নজর দেওয়া হয়; স্থানীয় চাহিদার পরিবর্তে কৃষিকে বাজারের চাহিদা পূরণে ব্যবহার করা হয়। কৃষি, পরিবেশ, পানি ও ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেসব



পরিবর্তন হচ্ছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, আমরা প্রকৃতির সংরক্ষণকে পেছনে ফেলে বাণিজ্যিকীকরণ ও ভোগবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছি। ফলশ্রুতিতে, স্থানীয় জ্ঞানের পরিবর্তে ধার করা বুদ্ধির প্রভাব বেড়েছে, মনোকালচার প্রসার পেয়েছে, পানি দূষিত হয়েছে, খাদ্যের মান হ্রাস পেয়েছে, এবং স্থানীয় বীজ ও জাত কৃষকের মাঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের কৃষি, জলবায়ু, পানি ও মাটি সংক্রান্ত নীতিপদ্ধতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এসব নীতি প্রণয়ন ও সংস্কার কাজে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন যেমন, জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক কোম্পানি ও দাতাসংস্থা প্রমুখের সংশ্লিষ্টতা দেখা যায়। এসব নীতিপদ্ধতি ও সংস্কারের ক্ষেত্রে বাজারমুখী লক্ষ্যগুলো, যেমন, দক্ষতা, উৎপাদন, প্রবৃদ্ধি, ভোগ ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্ব পায়। বর্তমানের কৃষি রাসায়নিক নির্ভর হওয়ার ফলে এখানকার জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়েছে, জলবায়ুর পরিবর্তন ও নাইট্রোজেন চক্রের ক্ষতি হয়েছে। আর এসবের হিসেবনিকেশ আগে থেকে করা হয়নি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কৃষিতে বিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বহুজাতিক কর্পোরেশন আন্তর্জাতিক সংগঠন ও সরকারগুলোর মাধ্যমে বাণিজ্যিক চিন্তা ও পণ্য-দ্রব্যের প্রসার ঘটচ্ছে।

কৃষি কর্পোরেশন নির্ভর হওয়ার ফলে এটি মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্যে অনিরাপদ, মাটির বৈশিষ্ট্য ধ্বংসকারী, উপকারী পতঙ্গ ও অনুজীব ধ্বংসকারী হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এর ফলে বাস্তুসংস্থান অস্থিতিশীল হয়ে পড়ছে, দূষণ ছড়িয়ে পড়ছে, এবং অজানা ও দুরারোগ্য সব রোগে মানুষের মৃত্যু বাড়ছে। অ্যামেরিকান জার্নাল অব ট্রপিকেল মেডিসিন প্রকাশ করেছে, শক্তিশালী কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক (এডোসালফান) ২০১২ সনে বাংলাদেশের ১৩টি শিশুর মৃত্যুর কারণ। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ২০১৫ সনে এই উপাদানটি নিষিদ্ধ করার পক্ষে অবস্থান নিলেও যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে যায়।

অনেকেই কৃষির সংকটের সাথে নব্য-উদারতাবাদের সম্পর্ক দেখেন, যে কারণে কৃষি ইনপুটের দাম বেশি, সরকারি বিনিয়োগ কম, বিশ্ব বাজারে অস্থিতিশীলতা, মধ্যস্বত্বভোগীর প্রভাব,



প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের অভাব, রাসায়নিকের প্রভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি ও মাটি ক্ষয়, কীটের প্রসার, অবকাঠামোর অভাব, পল্লী অর্থনীতির মন্দা, অকৃষি খাতের প্রসার, পশুসম্পদের কমতি, ফসলের ধারাপতন, খাদ্য নিরাপত্তার অভাব ও নীতি গ্রহণে ধীরগতি দেখা যায়। বাজার, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদির বিবেচনায় রাষ্ট্রের নানান খাতের কর্মীবর্গের জন্যে বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, ব্যাংক-বীমা সুবিধা, রেশন ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়; অথচ, কৃষকের বেঁচে থাকার প্রশ্নেরই মীমাংসা হয় না।

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষিতে সংস্কার

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন বোঝা যাবে এখানকার গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাতের ধরন ও সময় পরিবর্তন, পানির স্তর হ্রাস, জলরাশির হ্রাস, খরা ও বন্যার মত দুর্যোগ বৃদ্ধি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নানান বিবর্তন আগেও ঘটেছে, এখনও ঘটছে। দেশে দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে যুক্ত হয় নানাবিধ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, যেগুলো অনেক সময় সুচিন্তিত ও যথাযথ হয় না; বরং সেগুলোর প্রভাবে প্রাকৃতিক ও ভূতাত্ত্বিক ক্ষতি আরও বাড়তে থাকে। কৃষিকে জলবায়ু স্মার্ট করতে গিয়ে দেশে দেশে বাণিজ্যিক কৃষির পক্ষে ভূমি-অধিগ্রহণ, হাইব্রিড ও জিএম শস্যের বিস্তার ও বিষাক্ত দ্রব্যের প্রয়োগ বাড়ছে। এতে কৃষিতে বড় বড় কোম্পানির (ইয়ারা, সিনজেন্টা, মনসানটো/বেয়ার, ম্যাকডোনাল্ড প্রভৃতির) অনুপ্রবেশ বাড়ছে, এবং এসব কোম্পানি কৃষি ও গবেষণা অ্যালায়েন্স গড়ে তুলছে। আবার কৃষিকে জলবায়ুসহিষ্ণু করার নামে প্রাকৃতিক কৃষিপদ্ধতিগুলোকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করা হচ্ছে। ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার (সিএসএ)র আওতায় কনজারভেশন এগ্রিকালচারের নামে প্রচুর আগাছানাশক ছড়ানো হচ্ছে; শস্যকে খরা, বন্যা, ও লবণ সহিষ্ণু করার নামে জেনেটিক্যালি মডিফাইড (জিএম) শস্য আনা হচ্ছে; পশুসম্পদের প্রসারের নামে প্রক্রিয়াকরণ, মোটাতাজাকরণ, বাজারজাতকরণ ও বিপণন ব্যবস্থাকে মৌলিক বিবেচনা করা হচ্ছে; প্রযুক্তি বলতে বেশি বেশি যান্ত্রিকীকরণ করা হচ্ছে। অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে কৃষিতে আনীত কেন্দ্রীভূত কোন জাদুকরী সমাধান স্থানীয় কৃষক সম্প্রদায়ের জন্যে উপকারী নয়। বস্তুত, কৃষির চেয়ে বাজার ব্যবস্থার দিকে নজর রেখেই এরকম অনেক সমাধান দেওয়া হয়। এতে কৃষকের চেয়ে কর্পোরেশনগুলো কয়েকগুণ লাভ করে।

বাংলাদেশে জলবায়ুসহিষ্ণু নানান প্রযুক্তি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, এবং জলবায়ু সহিষ্ণু কিছু জাতও উদ্ভাবিত হয়েছে। তবে, এসবের মূল লক্ষ্য উৎপাদন বৃদ্ধি। সেখানে মাটির স্বাস্থ্য,

জীববৈচিত্র্য, প্রতিবেশ ব্যবস্থা ইত্যাদি দিকগুলো গৌণ হয়ে পড়েছে। অন্যান্য শিল্পের সাথে সাথে বৃহদাকার সার ও কীটনাশক কোম্পানি-কারখানাগুলোও একদিকে বায়ুদূষণ, পরিবেশ দূষণ তথা জলবায়ুকে উত্তপ্ত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখে, অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার নীতি-পদ্ধতি নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারকে প্রেসক্রিপশন-পরামর্শ দেয়।

আমরা দেখছি, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় কৃষিগবেষণা প্রতিষ্ঠান কমবেশি গ্রোথ মডেল দ্বারা প্রভাবিত এবং তারা অনেকাংশে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও কর্পোরেশনগুলোর তত্ত্ব ও নির্দেশনা মেনে চলছে। এতে, স্থানীয়জাত ও উৎপাদন ব্যবস্থার বিরুদ্ধ-ব্যবস্থাই বেশি শক্তি পাচ্ছে। প্রকারান্তরে, রাসায়নিক নির্ভর জিএম, হাইব্রিড, মনোসেব জাতগুলো কি আমাদের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জটিল কাঠামোকে ভেঙে ফেলছে না? এগুলো কি সুস্থায়ী ও ঘাতসহ উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক?

প্রশ্ন থাকছে, কৃষিতে যত গবেষণা, কৌশল ও প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, কৃষিতে উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা ও অপুষ্টি কমেছে কী? কৃষিতে কৃষকের অধিকার কতটুকু বজায় থাকছে?

রিইব-এর অভিজ্ঞতা ও ডায়ালগের লক্ষ্য

রিইব উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রকৃতিবিমুখতা, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের সমূহ ঝুঁকি, এবং বাংলাদেশে মাটি ও প্রকৃতিতে দীর্ঘ মেয়াদী বিপর্যয়ের দিকগুলো বিবেচনা করে প্রতিবেশনির্ভর কৃষি (এগ্রোইকোলজি) পুনরুত্থানের জন্যে কাজ করছে। রিইব মনে করে, আমরা অভিযোজনের পক্ষে যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছি সেগুলো টেকসই হতে হবে, যেখানে শস্য আবর্তন থাকবে, স্থানীয় ঐতিহ্যগত জাতের চাষ হবে, বীজের উপর কৃষকের অধিকার থাকবে ও প্রতিবেশ বাঁচবে, তথা স্থানীয় খাদ্য সার্বভৌমত্ব গড়ে উঠবে। কৃষি, পানি, বন ও পরিবেশের ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনার সময় আমরা যেন আরো বেশি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে কথা বলতে পারি, উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনায় স্থানীয় প্রেক্ষিতকে বিবেচনায় আনতে পারি এবং আমাদের ক্ষতিসমূহ নিয়ে সমমনা সংগঠনগুলোর মধ্যে আলোচনা করতে পারি ও বিভিন্ন পর্যায়ে যুক্তি-তর্ক তুলে ধরতে পারি।

অনেক বেসরকারি সংস্থা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি ও প্রকৃতি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। নিজস্ব চিন্তা ও অঞ্চল ভিত্তিক প্রাকৃতিক পার্থক্যের কারণে এসব সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করে। প্রকৃতি ঘনিষ্ঠ কৃষিচর্চা, তথা, জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির পথে অনেকগুলো বাধা রয়েছে; যেমন, প্রতিবেশগত ধারণা, প্রশিক্ষণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, বিভিন্ন পর্যায়ে সহায়তা দান এবং ইতিবাচক চর্চার প্রসার ঘটানো। এসব সমস্যা মোকাবেলায় যেসব সংস্থা বা গোষ্ঠী প্রাকৃতিক কৃষি বা প্রতিবেশগত কৃষি বা জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির প্রসারে কাজ করছেন তাদের মধ্যে সমঝোতা ও ঐক্য থাকা দরকার। সমমনা সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে সংলাপের মধ্যে দিয়ে প্রতিবেশ ব্যবস্থা নিয়ে সাধারণ বোঝাপড়া তৈরি হতে পারে, সংস্থার লব্ধ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য সম্পদের বিনিময় হতে পারে। এ ধরনের ডায়ালগের সূত্র ধরে সংশ্লিষ্ট সংস্থা নির্দিষ্ট কোন সমস্যার সমাধানের জন্যে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি/দলের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে, বিষয় ভিত্তিক কাজ চিহ্নিত করতে পারবে, সমস্যার সমাধানের জন্যে পারস্পরিক কর্ম অঞ্চল ঘুরে দেখতে পারবে, পারস্পরিক দক্ষতা বিনিময় ও বৃদ্ধি করতে পারবে, উৎপাদন, ভোজ্য, উৎপাদক ও খামার ব্যবস্থাপনার মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে কৃষি ও প্রতিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একসাথে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে।

যুক্ত আলোচনা:

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা শেষে সভাপ্রধান মূল প্রবন্ধের উপর আলোকপাত করে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরার জন্যে আহ্বান জানান।

বাংলাদেশে কৃষি ও কৃষকের বৈশিষ্ট্য ও উন্নয়ন



ড. আতিক রহমান

বাংলাদেশ সেন্টার অব এগ্যাডভান্সড স্টাডিজ-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ড. আতিক রহমান বলেন, আমাদের দেশের এক-তৃতীয়াংশ কৃষক এখনো নিরক্ষর। তারা কৃষি বিষয়ক কোন বৈজ্ঞানিক পেপার পড়ে না। কিন্তু তারা ধান দেখে বলে দিতে পারে ধান কেমন হয়েছে। কৃষকরা এই জ্ঞান পেয়েছে উত্তরাধীকার সূত্রে। তাছাড়া আমাদের দেশের মহিলাদের ফসল উত্তোলন পরবর্তী ব্যবস্থাপনা ভালো। একদিকে ইকোসিস্টেমের পরিবর্তন হচ্ছে আবার ইনস্টিটিউশন ডেভেলপমেন্ট এর ফলে রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়ি পাকা হচ্ছে। যার ভালো ও খারাপ উভয় ফলই রয়েছে।

এফএও বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল কনসালটেন্ট (প্রোগ্রাম) ড. অনিল দাস বলেন, নানাবিধ সমস্যার পরেও কৃষিতেই আমরা সবচেয়ে সফল। সুতরাং শুধু সমালোচনা কিংবা ব্যর্থতা বিবেচনা না করে, সাফল্যগুলো উল্লেখ করে আমাদের আলোচনা করতে হবে। আমাদেরকে খাদ্য নিরাপত্তার দিকে অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে। আমরা যদি সুস্থায়ী কৃষির কথা বলি এবং সেখানে সামাজিক, পরিবেশগত এবং অর্থনৈতিক বিষয়গুলো যুক্ত করি, তাহলে জলবায়ু পরিবর্তনসহ আজকের আলোচ্য সব কিছু চলে আসবে। কৃষির সাথে ৩৪ বছর সংযুক্ত থাকার অভিজ্ঞতার আলোকে আমি বলতে পারি শুধু



ড. অনিল দাস

ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান দিয়ে বাস্তবে সব সমাধান সম্ভব না। সেটা একটা অনুষ্ঙ্গ হতে পারে, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে কোন মতেই সমস্যার সমাধান সম্ভব না। আমরা চাইলেও আমাদের কৃষিকে ধরে রাখতে পারছি না। কৃষি এখন খাওয়া-পরা থেকে বাণিজ্যিক হয়ে যাচ্ছে। এখানে সরকারেরও অনেক কিছু করার আছে, করছে এবং করবে। সমস্যা আছে কিন্তু তার সাথে সফলতাও আছে এবং সব কিছুর সামগ্রিক সমন্বয় সাধন করে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে।



ড. মজিবুর রহমান

আইইউবিএটি-এর অধ্যাপক ড. মজিবুর রহমান, আজকে আমরা বলতে পারি যে, ধান উৎপাদনে আমরা তৃতীয়, আলু উৎপাদনে অষ্টম, সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, মৎস্য উৎপাদনে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছি। এই সফলতা একদিনের নয়, এটা বহু বছরের এবং বিভিন্ন সংস্থার গবেষণার ফল। বিভিন্ন সময়ে প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং শস্যবহুমুখী প্রকল্পে যুক্ত থাকার কারণে কৃষি এবং কৃষকের সাথে সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ আমার হয়েছে। এক সময় আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল উৎপাদন।

কৃষকের সম্মানের প্রশ্ন

ড. আতিক রহমান বলেন, কৃষককে একসময় নীচু চোখে দেখা হত। বলা হত চাষা। চাষা খুব খারাপ শব্দ। এটা আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। এবার হাওরে খুব ভালো ধান হয়েছে। ধানের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে ধান কাটার লোক নেই। আরেকটা কথা বলা হচ্ছে, কৃষক জিপের প্যান্ট পরে ফেলেছেন, তিনি মাটির কাছে যেতে চাচ্ছেন না। এই পরিবর্তনকে স্বীকার করে নিতে হবে। এটা সামাজিক পরিবর্তন, এটা অর্থনৈতিক পরিবর্তন, এটা জীবনের পরিবর্তন।

ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট এর পানি বিজ্ঞানী মনোরঞ্জন মণ্ডল বলেন, ধান কাটার এবং ধান লাগানোর লোক পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ কৃষক এত বেশি নিগৃহীত হচ্ছে যে, কৃষক চান না তার সন্তান কৃষিকাজ করুক। কৃষক চাচ্ছেন তার সন্তান অন্য কোন কাজ করুক, কিংবা শহরে গিয়ে কাজ করুক। সেটা যদি ভ্যান চালানো হয় তাও ভালো।



মনোরঞ্জন মণ্ডল



ড. নিলুফার হাই করিম

জ্ঞানের সমন্বয়ের অভাব

রিইব-এর বিদ্যমান প্রকল্পের কোঅর্ডিনেটর (ট্রেনিং এন্ড ডকুমেন্টেশন) ড. নিলুফার হাই করিম বলেন, কৃষিকে বাঁচাতে হলে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। অন্যদিকে খাদ্য নিরাপত্তা আসতে পারে দুই ভাবে: ১) খাদ্য উৎপাদন, ২) পুষ্টি নিরাপত্তা। রিইব সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে। আমরা কৃষকদের সাথে সম্পৃক্ত থেকে তাদের চাহিদানুযায়ী কাজ করে থাকি,

যেখানে ঘাটতি রয়েছে সেটা বিজ্ঞান থেকেই তুলে নিয়ে তাদের দেয়া হয়। নীতি ও রাজনীতি প্রসঙ্গে আমরা সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করছি বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও ডায়ালগের মাধ্যমে। কিন্তু এটার পরিমাণ ও সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং যার যার অবস্থান থেকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের সাথে বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মপদ্ধতির মেলবন্ধন করে বিভিন্ন কর্মশালায় কৃষকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা করে রইব।

মনোরঞ্জন মণ্ডল বলেন, লবণাক্ততার কারণে ধান উৎপাদিত হচ্ছে না এ ধারণা ভুল। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে নদীর পানি ব্যবহার করেও ধান উৎপাদন সম্ভব। কৃষি নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের হাইড্রোলজিক্যাল (পানি বিষয়ক) জ্ঞান কম এবং স্বচ্ছ নয়। ফলে কৃষি ও কৃষকের সাথে যথাযথভাবে জ্ঞানের সমন্বয় হচ্ছে না।

কৃষকের স্বার্থ

কুষ্টিয়া জেলাভিত্তিক সংগঠন ফেয়ার-এর পরিচালক দেওয়ান আখতারুজ্জামান বলেন, কৃষকরা সব সময় একটি কথা বলে, সেটা হল তারা যে পরিমাণ টাকা কৃষিতে বিনিয়োগ করে সেটার রিটার্ন কখনো পায় না। ধানের দাম সরকার নির্ধারণ করে দেয় কিন্তু সব লাভ করে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা। ফলে কৃষকরা সবসময় ঋণগ্রস্ত থাকে। আমাদের নীতিগুলো হতে হবে বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং সুস্থায়ী।



দেওয়ান আখতারুজ্জামান

মনোরঞ্জন মণ্ডল বলেন, যেখানে সবকিছু বাণিজ্যিক হচ্ছে সেখানে কৃষিকে অবাণিজ্যিক করলে কৃষক টিকে থাকতে পারবে না এবং কৃষিতে উৎসাহিতও হবে না। সুতরাং বিরোধিতা না করে বিকল্প পথ অনুসন্ধান করতে হবে।

বাংলাদেশ কৃষক সমিতির নির্বাহী সদস্য লাকী আক্তার বলেন, ২০১৭ সন থেকে আমি কৃষি নিয়ে কাজ করছি। সুনামগঞ্জের হাওরাঞ্চলে প্রায় ২৩,০০০ মেট্রিক টন ধান উৎপাদিত হয়েছে। কিন্তু সরকার ক্রয় করেছে ৬,০০০ মেট্রিক টন ধান। বাকী ধান ক্রয় করার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে কোন সরকারি ক্রয় কেন্দ্র নাই। এছাড়া পুরো ক্রয় ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রিত হয় সিভিলিকিটের মাধ্যমে। অন্যদিকে ধান উৎপাদন করতে গেলেও কৃষকের আবার নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। যার



লাকী আক্তার

মধ্যে আছে পল্লী বিদ্যুতের ঘাটতির ফলে সৃষ্ট বৈদ্যুতিক সমস্যা। সবকিছুর পর ফসল হবার পর ধান কাটারও অনেক খরচ রয়েছে। কিন্তু যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে কৃষক ধানের লাভজনক মূল্য পাচ্ছে না। হাওরে মৎস্যচাষ বাড়ছে। ফলে সেখানে ইকোলজিক্যাল পরিবর্তনের সাথে সাথে আবার কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মাছের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হচ্ছে। যেখানে মাছ ধরতে পারার কথা সেখানে মাছ ধরতে গেলে আবার অনেক সময় কৃষককে গুলি পর্যন্ত করা হচ্ছে। অকাল বন্যার কবলে পড়ে কৃষক নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেগুলো পত্রিকায় আসছে না। কৃষককে না বাঁচাতে পারলে কৃষি বাঁচানো সম্ভব না। সবচেয়ে বড় যমুনা সার কারখানা ৮ মাস ধরে বন্ধ রয়েছে। বিদেশ থেকে সার আমদানী করে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে গ্যাস এবং বিদ্যুতের অভাব। কৃষক আলু উৎপাদন করে আলু বিক্রী করতে পারছে না। তামাকের উৎপাদন বাড়ছে কারণ তামাক বিক্রি করে নগদ টাকা পাচ্ছে। সুতরাং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করা এবং তার জন্য কৃষিনীতি পরিবর্তন করতে হবে।

খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্ন

ড. আতিক রহমান বলেন, কৃষির সাথে খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি জড়িত। একটি শিশু যার ডায়রিয়া আছে সে যতই খাচ্ছে তার খাবার বের হয়ে যাচ্ছে। এটা বন্ধ করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। বাংলাদেশের এক নম্বর কাজ হল খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু খাদ্য শরীরে না থাকলে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। গ্রামে দেখা যায়, অনেক শিশুর পেট মোটা। এটার কারণ হল কৃমি এবং আমরা তাদের যদি খাবার দেই সেটাও কাজে লাগছেনা, বরং কৃমির স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটছে। সুতরাং কৃমি সরাতে হবে খাদ্যের ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য। এসব কিছু সাথেই জলবায়ু পরিবর্তনের সম্পর্ক রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি প্রসঙ্গে ২০০৭ এর এ্যাসেসমেন্টে বলা হয়েছে সাউথ এশিয়াতে ১২-২০% ধান কমে যাবে এবং বীজের উৎপাদনও আশঙ্কাজনকভাবে কমবে। এছাড়া ধান কাটার আগে প্রচণ্ড বৃষ্টি হলেও ধান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশে তিনটি বড় বিপ্লব হয়ে যাচ্ছে। একটা হল কৃষিতে ধানের বিপ্লব হয়েছে। ১৯৭৪ সনে আমাদের লোক ছিল ৭ কোটি, কিন্তু আমরা খাওয়াতে পারতাম না। এখন ১৪ কোটি মানুষ খাওয়ানোর পরেও আমাদের চাল বেঁচে যায়। সুতরাং আমাদের প্রোডাকশন ভালো হচ্ছে, যদিও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাড়তি মানুষের বসবাসের জন্য ঘর-বাড়ি বেশি তৈরি করতে হচ্ছে, ফলে জায়গা কমে যাচ্ছে অর্থাৎ উর্বর জমির পরিমাণ কমছে। ধান ছাড়া সবজি ও খাদ্য সংস্কৃতি- এই দুইটি কালচারেও বিপ্লব ঘটেছে। ঢাকাতে এখন অনেক ফুলের দোকান দেখা যায়। এছাড়া প্রচুর ফলও হচ্ছে। আরেকটা বিষয় হল একুয়াকালচার। নদীতে ইলিশ বেড়েছে, জাটকা ধরা কমেছে, কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ইলিশের ডিম পাড়তে সমস্যা হচ্ছে। ইলিশ ডিম পাড়ার জন্য সঠিক তাপমাত্রা খুঁজে পাচ্ছে না।

হাইব্রিড ও উচ্চ ফলনশীল চাষ নিয়ে বিতর্ক

মনোরঞ্জন মণ্ডল বলেন, পরিপূরক ধান উৎপাদন করতে হবে। হাইব্রিড নিয়েও উদ্ভিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। সবকিছুই হাইব্রিড এবং এটাই প্রাকৃতিক ধারা। আমাদেরকে অবশ্যই গোন্ডেন রাইস অনুমোদন করতে হবে, কারণ দেশে প্রতিদিন গড়ে ৮৮ জন এবং বছরে ৩০,০০০ শিশু ভিটামিন-এ'র অভাবে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে ভিটামিন-এ যুক্ত যেসকল খাদ্য

রয়েছে তা যথেষ্ট নয়। সুতরাং বিকল্প হিসেবে গোল্ডেন রাইস ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। নিউটনের সূত্রানুসারে প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। মোবাইল ফোনেরও স্বাস্থ্য ঝুঁকি আছে, কিন্তু সেটা ব্যবহার হচ্ছে এবং এর বিকল্পও নেই। সুতরাং আমাদের কৃষকের জন্য এবং দেশের জন্য যা ভালো তাই করতে হবে। কৃষককে দরিদ্র হিসেবে দেখলে হবে না, ধনী করে তুলতে হবে।

অন্যদিকে, উবিনিগের পরিচালক সিমা দাস শিমু বলেন, বর্তমান কৃষি ব্যবস্থায় কৃষকের কথা চিন্তা না করে কর্পোরেট কৃষি তথা বহুজাতিক কোম্পানিকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। আমরা ‘নয়া কৃষি আন্দোলন’-এ ১৮টি জেলায় কাজ করছি যার সাথে প্রায় ৪ লক্ষ কৃষক যুক্ত। শরীর ভালো থাকলে যেমন মানুষের কোন সমস্যা হয় না, তেমনি মাটি ভালো থাকলে কৃষিকাজ ভালো হয়। স্থানীয় ধান নিয়ে চিন্তা না করে হাইব্রিডের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আমরা বলছি আমাদের জমি কমে যাচ্ছে এবং এ ব্যাপারে দৃষ্টি দিতে হবে। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিল্প-কারখানা কমানো। এখন লাঙ্গল দিয়ে চাষ হচ্ছে না, তার বদলে ট্রাক্টর ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করছে বিভিন্ন কোম্পানি বা কর্পোরেশন। লাঙ্গল দিয়ে চাষ করলে তেল বা ডিজেল লাগেনা, যা পরিবেশ বান্ধব। রাসায়নিক সারের বদলে গোবর বা জৈব সার ব্যবহার করলে, সেটাও পরিবেশ বান্ধব। আমাদের মনে রাখতে হবে হাইব্রিড এবং উচ্চ ফলনশীল এক কথা নয়।

প্রাকৃতিক চাষ নিয়ে বিতর্ক

সিমা দাস শিমু বলেন, কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে এবং সাথে সাথে তাদের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের হাজার হাজার জাতের স্থানীয় বীজ ছিল, যা হারিয়ে গেছে। তাই আমাদের শ্লোগান হচ্ছে: ‘বোনেরা বীজ হাতছাড়া করবেন না’। সার্বভৌমত্ব না থাকলে শুধু খাদ্য-নিরাপত্তা দিয়ে কিছু হবে না। বীজের উপর বহুজাতিক কোম্পানির দখল রোধ করতে হবে। নয়াকৃষি আন্দোলনকে উৎসাহিত করতে হবে। কৃষকদের মধ্যে পারস্পরিক বীজ বিনিময়ের অভ্যাস বাড়াতে হবে।



সিমা দাস শিমু

কর্পোরেট কৃষিতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করতে হবে। আমাদের সংগ্রহে ধানের লবণসহিষ্ণু প্রায় ২৬টি জাত, বন্যাসহিষ্ণু ১৫০টি ও অন্যান্য দুর্যোগসহনশীল ও গুণসম্পন্ন জাত আছে। এগুলো আরও ছড়িয়ে দিতে হবে। দেখা যাচ্ছে ধানের জমিতে তামাক উৎপাদন হচ্ছে অথচ তামাক কোন খাবার না। অন্য কিছু যদি উৎপাদন করতে হয় সেটা করতে হবে সেই জমিতে ধান চাষ হয় না যেখানে। এছাড়া আমরা এখন পোলট্রি বা কক মুরগী খাই, তার মান ভাল না। তাই আমাদের স্থানীয় পশুপালনেও মনোযোগ বাড়াতে হবে।

রাসায়নিক নির্ভরতা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি

দেওয়ান আখতারুজ্জামান বলেন, উৎপাদনের ক্ষেত্রে শুধু পরিমাণ না বাড়িয়ে আমাদের গুণগত মানের দিকেও নজর দিতে হবে। এই গুণগত মানের দিকে নজর না দেওয়ার কারণে আমরা যদি ফলাফল পর্যালোচনা করি তাহলে দেখবো, আমরা যে খাবার খাচ্ছি যেখানে বিষ থাকছে। বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি, মাছ, মাংসের মাধ্যমে আমাদের শরীরে এই বিষ ঢুকছে। সাম্প্রতিক সময়ে পত্রিকায় খবর এসেছে যে বর্তমানে আমাদের শরীরে ১৪/১৮টি এ্যান্টিবায়োটিক কোন কাজে লাগছে না। একসময় কৃষকরা নিজেই সার তৈরি করতো এখন সেটা করছে কর্পোরেটরা। সুতরাং কৃষকদের উন্নয়নের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, কারণ কৃষক বাঁচলে কৃষি বাঁচবে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে ফসলের পরিবর্তন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক জাবেদ হোসাইন বলেন, কৃষির যে ধরন, সেটা জীব বৈচিত্র্যের সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ, সাধারণত বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট জায়গায় কৃষি কাজ করা হয়। অর্থাৎ একাধিক প্রজাতি সরিয়ে ১টি বা ২টি প্রজাতি চাষ করা হয়। কিন্তু আমাদের অবশ্যই কৃষি করতে হবে এবং সেই সাথে হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন। এর ফলে যেসকল সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলো মোকাবেলায় আমাদের প্রথমেই সমস্যা নির্দিষ্ট করতে হবে ও কৃষকদের বিদ্যমান জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে। গত ১০০ বছরে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বেড়েছে ১.৫ ডিগ্রি। এছাড়াও বলা হয়েছে তাপমাত্রা বর্তমানের চেয়ে ১ ডিগ্রী বাড়লে কিছু ফসলের উৎপাদন কমে যাবে, যেমন ধান/গম, যেগুলো অনুন্নত বিশ্বে বেশি চাষ করা হয় এবং বাড়বে ভুট্টা, যেটি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে চাষ করা হয়। আমাদের উত্তরাঞ্চলে ভুট্টার চাষ করা হয়। সুতরাং বিকল্প ও পরিপূরক ফসল নিয়েও আমাদের ভাবতে হয়। এছাড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, কৃষকদের যে ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান আছে সেটা সংরক্ষণ করতে হবে এবং এটার সাথে বর্তমান আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে তাদের মাঝে সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে।



জাবেদ হোসাইন



এবিএম আনিসুজ্জামান

নাগরিক উদ্যোগ-এর প্রকল্প সমন্বয়কারী এবিএম আনিসুজ্জামান বলেন, আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে, যখন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব শুরু হয়নি, তখন পিরোজপুর জেলার কৃষকরা নিজেদের টিকে থাকার স্বার্থে ভাসমান চাষ পদ্ধতি আবিষ্কার করে। পানির উপর কচুরিপানার সাহায্যে তৈরি করা হয় ভাসমান বীজতলা। নদীতেও তারা এটা করতে পারে, যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সব জায়গায় পানির উচ্চতা বাড়তে পারে। সুতরাং এরকম চাষ পদ্ধতির বিষয়টি সবাইকে অবগত করানো যায়।

কৃষি সংস্কৃতির পরিবর্তন

ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের গবেষক তানভীর শাতিল বলেন, আমরা বর্তমানে যে সময়ে অবস্থান করছি সেখানে কৃষককে আলাদা করে দেখার কিছু নেই। একসময়ে কৃষকের কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল, অবস্থান ছিল, যার ভিত্তিতে তাকে আলাদা করে দেখা হত। কিন্তু বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সেখানে কৃষককে আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ আছে কিনা সেটা একটি প্রশ্ন। নিবিড় পদ্ধতিতে ধান চাষ (এসআরআই) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে কৃষকদের সাথে মেশার



তানভীর শাতিল

অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। সেখান থেকেই বলছি, কৃষক সমাজে বর্তমানে ‘মাগন কামলার’ প্রচলন নেই। মাগন কামলা ছিল একটি সামাজিক প্রথা। যেখানে সাধারণত অবস্থাসম্পন্ন কৃষক কোন কাজ দ্রুত শেষ করার লক্ষ্যে গ্রামের ছোট কৃষক বা প্রান্তিক কৃষকদের আমন্ত্রণ করত সবাই মিলে কাজটি শেষ করার জন্য। কৃষিতে বড় কৃষকের মাগন কামলা প্রথাটির ব্যবহার অনেক কমে গেছে। কিন্তু বর্তমানে ‘বদলি কামলা’ ব্যবস্থার প্রচলন আছে। অর্থাৎ ছোট বা ক্ষুদ্র চাষী, যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষেতে কাজ করে থাকেন, তারা পরস্পরের জমিতে ধান রোপন ও ধান কাটার কাজ একসঙ্গে করে কাজ দ্রুত সময়ে শেষ করে দেন। মূলত কাজের বদলে বিনা মজুরীতে কাজ করে দেয়া। গ্রামীণ কৃষক সমাজের যে সাংস্কৃতিক আবহ ছিল তা বর্তমান বাজার সংস্কৃতির তোড়ে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। সেগুলোর কার্যকারিতা নতুন ভাবে ভাবা যেতে পারে। তাই বাংলাদেশের কৃষক সমাজ ও সংস্কৃতির উপর নিবিড় গবেষণা জরুরী এবং পুরো প্রক্রিয়াটি জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত।

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাণিজ্যিক স্বার্থ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্র্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ এর প্রভাষক বিভূতিভূষণ সিকদার বলেন, আমাদেরকে জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা বুঝতে হবে। এটা খুবই মারাত্মক পর্যায়ে আছে। ২৯ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে হাওয়াই এর মাউনা কিয়া অবসারভেটরি থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডের রিডিং দিয়েছে ৪১০ পিপিএম, যা খুবই আশঙ্কাজনক। নাসা এবং কিয়া’র তথ্যমতে এরকম চলতে থাকলে পৃথিবীর অনেক অঞ্চল দ্রুত তলিয়ে যাবে, বাংলাদেশ যার মধ্যে অন্যতম। বিজ্ঞান মূলত কাজ করে ফ্যাক্ট ও এভিডেন্স এর উপরে ভিত্তি করে। এছাড়া বিজ্ঞানভিত্তিক নীতি-কৌশল নির্ধারণের সময়



বিভূতিভূষণ সিকদার

আমাদের নৈতিকতা, সমতা এবং ন্যায়তার কথা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। এটার সঙ্গে যদি আমরা ‘সুস্থায়ী’ বিষয়টা যুক্ত করতে পারি তাহলে ফলপ্রসূ হবে। যদিও কয়লা সবচেয়ে নোংরা জীবাশ্ম জালানী তারপরও সুন্দরবনে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। উন্নত দেশগুলো যখন পারমাণবিক বিদ্যুৎ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তখন আমরা রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করছি। এগুলো কোনভাবেই কাম্য নয়। কৃষকদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক তথ্য ও জ্ঞান সরবরাহ করতে হবে, যাতে তারা প্রকৃত অবস্থাটা জানতে পারে।

ড. আতিক রহমান বলেন, কৃষি ও জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি ও জীবন এগুলো সব একই কথা, আলাদা কোন বিষয় না। কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের একটা দিক আছে এবং আরেকটি দিক হচ্ছে অটোনমাস পরিবর্তন, যার ফলে কৃষি বদলে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিনিয়তই হচ্ছে সারা বিশ্বে। জাপানে গত ৫০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দেখা গেছে এবং সবচেয়ে বড় বন্যা হয়েছে গত সপ্তাহে। এথেন্সে গরমে লোক মারা গেছে এটা কেউ কখনো বলতে পারবেনা। কিন্তু সেখানেও অতি গরমে লোক মারা যাচ্ছে। অটোয়াতেও অতি গরমে ২০০ লোক মারা গিয়েছে গত মাসে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক রয়েছে। ২০১৬ সনে আমরা চাল রপ্তানী করেছি অর্থাৎ আমরা ছিলাম রপ্তানীকারক। কিন্তু হঠাৎ করে হাওড়ে বন্যার কারণে আমরা হয়ে গেলাম চাল আমদানীকারক। থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম থেকে চাল আমদানী করার পরও যাতে চালের স্বল্পতা না দেখা দেয় সেজন্য সরকার এমনকি মিয়ানমার থেকেও চাল ক্রয়ের উদ্যোগ নিল, যারা কিনা আমাদের দেশে রোহিঙ্গা পাঠিয়ে দিয়েছে। এসব কারণে কৃষি বাজার খুবই সেনসেটিভ হয়ে যায় এবং আমরা বিপদে পড়ে যাই। সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন কৃষককে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল, কেমন আছেন? তারা বলে, “কিছু একটা সমস্যা হয়েছে”। কী সমস্যা জানতে চাওয়ায় তারা বলছে: সময়মত বৃষ্টি আসছে না। তারা যে জ্ঞান জানেন সেটা বর্তমান প্রকৃতির সাথে মিলছে না। প্রকৃতি বিরূপ আচরণ করছে এবং প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। বাংলাদেশের কৃষকদের মতামত হল “ক্যামন যেন সব আউলাইয়া গ্যাছে”। ড. আতিক রহমান বলেন, কৃষকের লোকজ জ্ঞান যদি পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তাহলে নলেজ গ্যাপের কারণে প্রোডাকশন গ্যাপ সৃষ্টি হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে পানি সরবরাহে, যার ফলে হিমালয় থেকে বেশি পানি এসে বন্যার সৃষ্টি করছে। ফলে কৃষির ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। এছাড়া তাপমাত্রা বৃদ্ধির ভারসাম্য বজায় থাকছে না এবং মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। খাদ্য-পুষ্টির নিরাপত্তার মাধ্যম হল কৃষি, তাই এখানে মনোযোগ দিতেই হবে।

মনোরঞ্জন মণ্ডল বলেন, এটা খুবই সত্য কথা যে, প্রকৃতি ঠিকমত কথা শুনছে না। যখন বৃষ্টি হবার কথা তখন হচ্ছে না। এজন্য আমরা বিজ্ঞানীরা বলছি, আগে যেখানে নির্দিষ্ট সময়ে ধান লাগানো এবং কাটা হত, এখন সেটা যেকোন সময়ে লাগানো এবং কাটা সম্ভব। সুতরাং বিজ্ঞানকে অস্বীকার করলে চলবে না। ঐতিহ্যবাহী কৃষির সাথে বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করতে হবে। এজন্য কৃষককে অবশ্যই নতুন জ্ঞানের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

বিসিএস-এর রিসার্চ ফেলো দ্বিজেন মল্লিক বলেন, বাংলাদেশের নীতি-কৌশল দুর্বল না, বাস্তবায়ন দুর্বল। বর্তমান কৃষিনিতিতে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকারক প্রভাব মোকাবেলার কথা বলা আছে, প্রতিবেশ-বান্ধব কৃষির কথাও বলা আছে, কিন্তু সেগুলোর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব



দ্বিজেন মল্লিক

প্রান্তিক কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, প্রয়োজনীয় প্রণোদনা দিতে হবে এবং সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে।

দেওয়া হচ্ছে না। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুর্বলতার অন্যতম কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক প্রভাব। অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতি-কৌশলের ক্ষেত্রে নীতি নাই কিন্তু কৌশল আছে। সেখানে খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, অভিযোজন, এসকল বিষয় আছে। অভিযোজন করতে গিয়ে স্থানীয় জ্ঞান দিয়ে সবসময় কৃষিকে শক্তিশালী করা নাও যেতে পারে, তার সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞানেরও সমন্বয় দরকার। জলবায়ু পরিবর্তন রোধের দুটি পথ আছে, অভিযোজন এবং প্রশমন। এজন্য

নেটজ বাংলাদেশের প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ মনিরুজ্জামান বলেন, সাতক্ষীরাতে ধানের বদলে লবণাক্ত পানিতে চিংড়ী চাষের ফলে কৃষকরা কর্মহীন হয়ে পড়ছেন। একদিকে চিংড়ীকে বলা হচ্ছে হোয়াইট গোল্ড, যার ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে, কিন্তু অন্যদিকে কৃষক কাজ/ জায়গা হারাচ্ছে। এর ফলে সেখানে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে। ঠিক সেরকমভাবে উত্তরবঙ্গের দিকে তাকালে দেখা যায়, সেখানে প্রচুর আম চাষ করা হচ্ছে, সাথে হচ্ছে পুকুর এবং মাছ চাষ। যার ফলে অন্য ফসলের চাষের জমি কমে যাচ্ছে এবং কৃষকও কর্মহীন হয়ে পড়ছে। একসময় সেখানেও সামাজিক অবক্ষয় বা বিশৃঙ্খল দেখা যাবে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে সেখানে শীতকাল ও গরমকালের সময়কাল কমে যাচ্ছে, কিন্তু স্বল্প সময়ে এর ব্যাপকতাও বাড়ছে। এ পরিবর্তনের সাথে আমরা খাপ খাওয়াতে পারছি না, ফলে দেখা দিচ্ছে সামাজিক বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা। এছাড়া আমরা বাজার ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারছি না।



মোঃ মনিরুজ্জামান

নিজেরা করি'র প্রতিনিধি মিজানুর রহমান বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন হওয়ার জন্যে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ অনেকাংশে দায়ী। কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সুন্দরবন ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে, ফলে জনবিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে।



মিজানুর রহমান



আবু নাসের অনিক

এইড ফাউন্ডেশন'র প্রতিনিধি আবু নাসের অনিক বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর ফলে সৃষ্ট সমস্যা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফল। এসব সমস্যা মোকাবেলায় বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, কিন্তু সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছে না। আমাদেরকে ব্যালেন্সড ডেভেলপমেন্টের কথা ভাবতে হবে, যার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

কৃষি জমি ও প্রকৃতি

নিজেরা করি'র প্রতিনিধি মিজানুর রহমান বলেন, বিভিন্ন এলাকাকে ইকোনমিক জোন হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে। অবাধে তৈরি করা হচ্ছে ইটের ভাটা। যার ফলে মাটি দূষিত হচ্ছে, ফসলের জমি কমে যাচ্ছে, সাথে কমছে ফসলের উৎপাদনও। আবার বিভিন্ন হাউজিং প্রকল্পের জন্য জমির বরাদ্দ হচ্ছে, ফলে উর্বর জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এসকল সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারি বিভিন্ন অফিসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। অনেক আইন থাকা সত্ত্বেও তা যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। সুতরাং এ ব্যাপারে দৃষ্টি দিতে হবে এবং সরকারি নীতি প্রণয়ন ও সংস্কার করতে হবে। সর্বোপরি এসব ব্যাপারে ব্যাপকহারে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।



ফারহানা ফেরদৌস

এএলআরডি'র প্রতিনিধি ফারহানা ফেরদৌস বলেন, রাসায়নিক সারের বিকল্প হিসেবে জৈব সারের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে আরো সচেতন হতে হবে। ইট বানাতে গিয়ে টপ সয়েল ব্যবহার করার কারণে জমির উর্বরতাও হ্রাস পাচ্ছে। এর বিকল্প হিসেবে ব্লক ব্যবহার করা যায়। এছাড়া নদী রক্ষায় আরও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে, যেন নদীর নাব্যতা ঠিক থাকে। তাহলে নদীতে পানি থাকবে আর পানি থাকলে মাছ থাকবে। কৃষি ও কৃষকদের সুরক্ষার জন্য যথাযথ আইন পাশ করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

স্থায়ী উন্নয়ন চিন্তা

ড. মজিবুর রহমান বলেন, বর্তমানে আমরা উৎপাদন করে চাহিদা মিটিয়ে সেটা রপ্তানীও করতে পারছি। যদিও বলা হচ্ছে, সকলের ক্ষুধা ও পুষ্টির চাহিদা মেটানো এখনও সম্ভব হয়নি। কিন্তু এটাও বলা দরকার এসব কারণে বিষয়টি এমডিজি থেকে এসডিজি'তে আসছে। কৃষকদের বিভিন্ন বিষয়ে যেমন: উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ ধারণাগুলোর ব্যাপারে প্রশিক্ষণের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আনারস প্রক্রিয়াজাতকরণ করে কৃষক জ্যাম বা জেলি তৈরির মাধ্যমে অধিক লাভ করতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে সঠিক প্রযুক্তি ও দিক নির্দেশনা দিতে হবে। কৃষকদের খাদ্যাভাসের প্রতি তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারেও কাজ করতে হবে। কৃষকরা এখনও তিন বেলা ভাত খায়, কিন্তু সবজি কম খায়। কিন্তু কৃষির স্বার্থেই কৃষকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা জরুরী।

দেওয়ান আখতারুজ্জামান বলেন, কৃষি বাঁচাতে হলে সবার আগে কৃষককে বাঁচাতে হবে। তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়া কৃষকদের পেনশনের ব্যবস্থা করা উচিত। কৃষকদের সমস্যাগুলো নিয়ে সরকারকে ভাবতে হবে, এজন্য প্রয়োজনে কৃষকদের সংগঠিত করে আন্দোলন করতে হবে। আর রাষ্ট্রীয় ও নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে কৃষক প্রতিনিধি রাখতে হবে।

সিএসআরএল-এর সমন্বয়কারী প্রদীপ কুমার রায় বলেন, বাংলাদেশ খুবই ছোট একটি দেশ। এটি কৃষি প্রধান এবং কৃষি নির্ভর দেশ। আমাদের দেশের আয়তন না বাড়লেও জনসংখ্যা বাড়বে। এখানে পাহাড়ে কৃষি, হাওড়ে কৃষি, চরে, উপকূলে এবং সমতলেও কৃষি। সুতরাং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষির উপর এর প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশ ছোট হলেও আমাদের দেশ ৩০টি কৃষি-প্রতিবেশ অঞ্চলে বিভক্ত। এই কৃষি-প্রতিবেশ অঞ্চলগুলোর বিভিন্নতা নিয়ে ভাবতে হবে। কৃষিতে বৈজ্ঞানিক সমাধানের সম্ভাবনা ও সমস্যা দুইটাই খতিয়ে দেখতে হবে। বিশেষ করে বায়ো-টেকনোলজি ব্যবহারে কতটুকু সম্ভাবনা বা সমস্যা আছে সেটাও খুব ভাল করে খতিয়ে দেখা উচিত। শুধু বাজার-অর্থনীতির দিক থেকে দেখলে হবে না, এসব বিষয়কে সব সময় সন্দেহ করতে হবে এবং ভালভাবে গবেষণা করেই মাঠ পর্যায়ে নিতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম ফল হচ্ছে মাইগ্রেশন। এ ব্যাপারটিকে বৈশ্বিক দূতালি হিসেবে দেখতে হবে।

নির্ধারিত আলোচকদের বক্তব্য:

আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কৃষি ও কৃষকের বিবর্তন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম খান বলেন, আজকের আলোচনাকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে অনেকে তাদের ব্যক্তিগত এবং বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করেছেন। দুটো বিষয় মিলিয়ে এখানে তিনটি অবস্থান তৈরি হয়েছে। যিনি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন, তিনি একটি সামগ্রিক কাঠামো নির্মাণ করেছেন, যেটাকে বলা যায় একটি 'কম্প্রিহেনসিভ পজিশন', যেখানে তিনটি বিষয় যুক্ত করা হয়েছে: কৃষি, পলিটিক্যাল ইকোনমি এবং জলবায়ু সংকট। এটা হল প্রথম অবস্থান বা কম্প্রিহেনসিভ পজিশন, যেটাকে র‍্যাডিক্যাল পজিশনও বলা যায়। পরের দুটি অবস্থানের মধ্যে একটি জিনিস লক্ষণীয়, সেটা হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যেটা দিয়ে চিহ্নিত



মনিরুল ইসলাম খান

সমস্যার সমাধান করা যায়। আমি জলবায়ুর চরম পরিবর্তনের সমাধান চাচ্ছি, আবার কৃষির প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য যে সংকট তৈরি হয়েছে সেটারও সমাধান করতে চাই। তৃতীয়ত আমাদের সভাপতির একটা অবস্থান আছে, যেটাতে বিজ্ঞানকে প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে, বলা হচ্ছে আমরা যে পুঁজিবাদি কাঠমোর মধ্যে আছি সেটাই থাকতে হবে। সুতরাং এর মধ্যে আমাদের বেষ্ট সলুশন বের করতে হবে। যেহেতু মনে করা হচ্ছে এটা একটা বৈজ্ঞানিক সমস্যা সুতরাং বিজ্ঞানের মধ্যে থাকলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে মূল প্রবন্ধের অবস্থান নাকচ করে দিতে হবে এবং এটার যৌক্তিকতাও প্রশ্নবিদ্ধ হবে। কিন্তু যৌক্তিকতা অবশ্যই আছে, দেখতে হবে বিজ্ঞান কি এখানে নিরপেক্ষ? নাকি কারো পক্ষ হয়ে কাজ করছে? এখানে বিজ্ঞানকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সম্পূর্ণরূপে কারো হয়ে কাজ করছে। দুটো পক্ষ আছে এখানে, একটা হলো স্টেট আরেকটা হলো করপোরেট। রাষ্ট্র চাচ্ছে সাবসিসটেন্স বা খাদ্য নিরাপত্তা তৈরি করতে। স্টেটকে পাঁচ বছর পর পর ইলেকশনে যেতে হয়, সুতরাং স্টেটকে মিয়ানমার থেকে খাদ্য এনেও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয় এবং নাগরিক অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্যে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। সুতরাং বিজ্ঞান এখানে নিরপেক্ষ না। একদিকে করপোরেটরা বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে যাবে, যেটা কিনা মুনাফার দিকে যাবে। আরেকদিকে স্টেট তার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাইবে। সুতরাং এটা যদি নিরসন করতে হয় তখন সেই কম্প্রিহেনসিভ ফ্রেমওয়ার্ক এর মধ্যে থাকতেই হবে। তাহলে, মুনাফার স্বার্থে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।

ধরা যাক বাংলাদেশ শুধু একটা রাষ্ট্র। স্বাভাবিকভাবেই প্রযুক্তি তখন এতটা মুনাফামুখী হত না। অবশ্যই পরিবেশ-বান্ধব হত এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়গুলো হয়তো আসতো না। সুতরাং এই জায়গাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ ড. আতিক রহমান এর অবস্থান অনুযায়ী বিজ্ঞান দিয়েই এটাকে রেসপন্ড করা সম্ভব এবং রাজনৈতিক অর্থনীতিকে গৌণ উদ্দেশ্য হিসেবে রেখে। কিন্তু সেখানে একটা বড় ঝুঁকি আছে যে, দীর্ঘমেয়াদে সেটা সুস্থায়ী হবে কিনা। যদি ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেসপনসিভ সিড দেওয়া হয় সেটা আগামী ৩০ বছর পর কী ধরনের সমস্যা করবে। করপোরেটরা তখন চুপ থাকবে কীনা, কিংবা স্টেট সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তার সাবসিসটেন্স এর জন্য কাজ করতে পারবে কীনা এটা একটা বড় প্রশ্ন। কারণ স্টেট বনাম করপোরেট এর অবস্থানটা আগামী ১৫-২০ বছর পর কী দাঁড়াবে এটা নিশ্চিত না। আলামত খুব ভালো না। কারণ মি. ট্রাম্প যখন ইপিএ'তে ডিরেক্টর বানালা একজন এনার্জি সেক্টর এর লোককে, সেটা শতভাগ জেনেগুনেই বানানো হয়েছে; যে এসেই বলছে, আমরা নীতিগুলো আরো শিথিল করব, অর্থাৎ ওবামা প্রশাসন যা যা করেছে সেগুলোকে আরো শিথিল করা হবে। কারণ মি. ট্রাম্প ম্যান্ডেট নিয়ে এসেছে যে, কোল মাইনকে আবারো সচল করা হবে। সুতরাং ট্রাম্প এখানে ব্যক্তি হিসেবে কাজ কাজ করছে না, কাজ করছে একটা নির্দিষ্ট স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে। সেটাই আজকের প্রবন্ধের মূল বিষয় যে, স্ট্রাকচারের বিরুদ্ধে কাজ করা হবে কিনা। আবার যদি মনে করা হয় একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে কাজ করা হচ্ছে, যেখানে বিজ্ঞান উইশফুল থিংকিং, সেটা

দিয়ে স্ট্রাকচারাল ইমপেরেটিভগুলো কতটা এ্যাড্রেস করা যাবে। সেটা প্রশ্নবিদ্ধ কারণ এখানে বিজ্ঞান একটা সহায়ক জ্ঞান হিসেবে কাজ করছে। এটাকে যদি একটা কমিউনিকেটিভ কনসেনসুয়াল নলেজে নিয়ে যেতে চাওয়া হয়, অর্থাৎ যেখানে উৎপাদন থেকে সাবসিসটেন্স এ প্রবেশ করা হবে। একটি সুস্থায়ী কৃষি তৈরি করতে চাইলে সেটা এক ধরনের রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক এ্যাপ্রোচ এর মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে গেলে সেটা অর্ধেক সফল হবে কারণ কর্পোরেট চুপ করে থাকবে না এবং এসে বলবে এটা জলবায়ু পরিবর্তন না এটা সাইক্লিক্যাল, যেটা এখন অ্যামেরিকান পজিশন। এটা সাইক্লিক্যাল; পৃথিবীতে ১,০০,০০০ বছর পর পর পরিবর্তন হয় এবং এটা শেষ পরিবর্তন সাইকেলের মধ্যে আছে। কার্বন পোড়ানো মেজর কিছু না; কার্বন আরো বহুদিন পোড়ানো যাবে। সুতরাং এটাকে মাথায় রাখলে, আজকের প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু সেখানেই। বৈজ্ঞানিক সল্যুশনে হয়তো দ্রুত যাওয়া সম্ভব, সরকারও সেই বিষয়গুলোতে সমর্থন দেবে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে সেটা সাস্টেনেবল হবে কিনা। যেই দাবিগুলো তোলা জরুরী, সেটা হলো আমরা খাদ্য নিরাপত্তা গিভেন প্রযুক্তি চাচ্ছি, ভোগবাদ ও মুনাফা নির্ভর প্রযুক্তি না। এবং ঐ জায়গাতে একটা প্র্যাগমেটিক শিফট করতে পারি। পুঁজিবাদ যখন এসেছিল লেফট এবং রাইট সবাই সেটাকে সাধুবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু লেফট-রা যে কারণে একে সাধুবাদ জানিয়েছিল তা হয়নি। সুতরাং পুঁজিবাদী ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে থেকে বিজ্ঞানকে আবার কাজে লাগানোর বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ থেকেই যায়। সুতরাং সেটাও মাথায় রাখতে হবে। যেহেতু বৈজ্ঞানিক ফ্রেমওয়ার্কের বিভিন্ন রকম সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সেহেতু সিটিজেন প্রযুক্তির কথা বলা যেতে পারে, যেটা সিটিজেন এর উপকার করে। সেজন্যে বিজ্ঞান এবং তার জন্য বাজারকে প্রফিট এর দিকে নেয়া হবে, নাকি এক্সচেঞ্জ টুল হিসেবে দেখা হবে সেখানেই আজকের আলোচনাকে আমরা নিতে পারি।



আনু মুহাম্মদ

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, আজকের আলোচনায় অনেকগুলো সম্পর্কিত বিষয় আছে, তবে সমাধান বের করার জন্য সমস্যাটা সামগ্রিকভাবে বোঝার ব্যাপার আছে। সমস্যাটা হয়তো আমরা জানি, কিন্তু সেটা স্বীকার করি কিনা, এটা একটা সমস্যা। আবার যেটা সমস্যা সেটাকেই সমাধান মনে করা হচ্ছে কিনা। আমাদের সামগ্রিক কৃষি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যে যে সম্পর্ক, তাতে যে সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়েছে বলে আজকের আলোচনায় বলা হচ্ছে, সেটা হল কৃষি যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বিকশিত হচ্ছে তাতে আমাদের প্রকৃতি, আমাদের জৈব শক্তি, আমাদের

জীববৈচিত্র্য এবং কৃষকের স্বার্থ, কৃষকের অধিকার, কৃষকের সাসটেনেবিলিটি এই ধরনের বিষয়গুলো বড় ধরনের ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। সেই সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বাড়ছে। বাণিজ্যিকীকরণ এবং ভোগবাদ হল বর্তমান উন্নয়ন দর্শনের একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। কৃষি বাণিজ্যিকীকরণের দিকে গেছে এবং এটা পুঁজিবাদি বিকাশের একটা ধারায় খুবই সঙ্গতিপূর্ণ একটা যাত্রাপথ বলে প্রথমে চিহ্নিত করা যায়। আর এই উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্র হচ্ছে মুনাফা সর্বোচ্চ হারে বৃদ্ধি। যেখানে মুনাফা বেশি হবে সেটাই যুক্তিযুক্ত এবং মুনাফার সর্বোচ্চ হারে

বৃদ্ধির জন্য যা যা করা দরকার সেটাই করতে হবে। যার কাছে পুঁজি আছে মুনাফা তার। সেই মুনাফার মালিক হতে পারে লোকাল গ্রুপ যারা রিয়েল স্টেট করতে চায়, যারা ইন্টারনেট করতে চায় কিংবা যারা চিংড়ি ঘের করতে চায় তারা। সুতরাং এভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কৃষি সেদিকেই যাচ্ছে, খুব যুক্তিযুক্তভাবেই যাচ্ছে, এটা খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। এখানে বলা হচ্ছে বিভিন্ন উপায়ে পানি দূষিত হচ্ছে বা নষ্ট হচ্ছে। পানি নষ্ট হলে তো অসুবিধা নেই, পানির ব্যবসারও তো একটা জায়গা দিতে হবে! সুতরাং পানি যত বেশি নষ্ট হবে ব্যবসার জন্য তত ভালো হবে, মার্কেটিং তত করা যাবে এবং ইতোমধ্যে পানির ব্যবসায়ীদের একটা অবস্থান তৈরিও হয়েছে। জনসংখ্যা বেশি বলে বাংলাদেশের বাজারও বড়, পানি যত দূষিত হবে পানির বাজারও তত বেশি হবে এবং মুনাফাও বেশি হবে, সামগ্রিকভাবে জিডিপিও বাড়বে। আর জিডিপি যদি আমাদের চিন্তার কেন্দ্রে থাকে এবং সেটা নিয়ে যদি উচ্ছ্বসিত থাকা যায়, তাহলে এগুলো নিয়ে আপত্তি করাটা অসঙ্গতিপূর্ণ এবং অযৌক্তিক হবে। যতবেশি কেনাবেচা বাড়বে, তত বেশি এক্সচেঞ্জ বাড়বে, তত বেশি টাকার লেনদেন বাড়বে। বন উজাড় করে সেখানে যদি জমি হয় কিংবা নদী ভরাট করে সেখানে যদি জমি হয় তাহলে জিডিপি বড়বে এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধিও তত বেশি হবে।

কৃষিও এই হিসেবের বাইরে না। সুতরাং উন্নয়ন দর্শনের যে জায়গাটায় কেন্দ্র সেটা চিহ্নিত না করে, একটা অংশ সমর্থন করে আরেকটা অংশ বিরোধিতা করলে হবে না, সামগ্রিকভাবেই করতে হবে। কৃষকের যে লোকাল নলেজ বা ইন্ডিজিনাস নলেজ সেটা বিজ্ঞান এর বাইরে না। বিজ্ঞান মানে বিশেষ জ্ঞান, যে জ্ঞানের মাধ্যমে কৃষক এত বছর উৎপাদন করেছে, সাথে পানি ব্যবস্থাপনা, বীজ ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন, বিপন্ন বীজ রক্ষণাবেক্ষণ, সব কিছুতেই গভীর জ্ঞান ও জ্ঞান চর্চা জড়িত। সুতরাং এটাও সায়েন্সের বাইরে নয়। জ্ঞানের বিকাশ আছে। স্থানীয় যে জ্ঞান সেটাও সম্পূর্ণ না, আবার বাইরের যে জ্ঞান সেটাও সম্পূর্ণ না। যে সমস্যাগুলোর কথা এখানে বলা হচ্ছে সেগুলো সৃষ্টি হবার পেছনে সবচেয়ে বড় যুক্তি দেয়া হচ্ছে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর কথা। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আমাদের দেশীয় যে সমস্ত বীজ আছে, সেগুলোর উৎপাদনশীলতা নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করা হয়েছে কিনা। আমাদের লোকাল জ্ঞানের সাথে বাইরের জ্ঞান বা আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের যদি সমন্বয় করা হত তাহলে ইতিহাস অন্যরকম হত। কিন্তু সেটা করা হয়নি বা যায়নি, কারণ যারা এর পেছনে ছিলেন তাদের স্বার্থ অন্যরকম ছিল। আমাদের নীতি কৌশল থাকলেও কিছু নীতি বাস্তবায়ন হচ্ছে, কিছু নীতি বাস্তবায়ন হচ্ছে না, কিছু খুব দ্রুত গতিতে হচ্ছে, কিছু আবার মন্থর গতিতে। যেমন: পুলিশ কেস কোনটা খুব দ্রুত যাচ্ছে বা যাচ্ছে না এটা নির্ভর করে পেছনের শক্তিশালী পক্ষের উপর। সুতরাং নীতির ব্যাপারেও পরিবেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত, জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত, লোকাল জাত নিয়ে যে সকল কাজ হয়েছে সেগুলো অগ্রসর হবে না, যদি না সেগুলোর পেছনে প্রণোদনা বা শক্তি কাজ করে। জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে ভিন্ন প্রচারণা থাকলেও এর ঝুঁকির ব্যাপারে সবাই একমত প্রকাশ করে থাকে এবং বাংলাদেশের অবস্থা নাজুক। বাংলাদেশের নীতি-নির্ধারক কিংবা সরকারি প্রতিনিধিরা বিদেশে গিয়ে বলছেন, বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার জন্য ফান্ড কালেক্ট করছেন। কিন্তু দেশে এসে তারা কী কাজ করছেন সেটা প্রশ্নবিদ্ধ। আমাদের উপকূলীয় অঞ্চল পুরোটা হয়ে যাচ্ছে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। আবার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রও হবে। এটা খুবই আনন্দ, উচ্ছ্বাস এবং বড় ধরনের সাফল্য হিসেবে বলা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ ঝুঁকিতে রয়েছে, সেটা মোকাবেলার সাথে এগুলো সঙ্গতিপূর্ণ পদক্ষেপ নয়। বাংলাদেশের

যেসকল বিশেষজ্ঞ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, তারাও এসব ব্যাপারে কোন বিরোধিতা করেননি। বাংলাদেশের সরকার সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিজ্ঞা করছে, আর দেশের মধ্যে ঠিক তার উল্টো কর্মসূচি দিচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ের নদী ভাঙনের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ভারতের বাঁধ ছাড়াও আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রকল্প যেমন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও পানিসেচ প্রকল্পগুলোও দায়ী। নদী-নালা, খাল-বিল, পানিসম্পদ যেভাবে নষ্ট হচ্ছে সেগুলো সমাধান না করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করা কোনভাবেই সম্ভব না। নদীর প্রবাহ পরিবেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নদী মারা গিয়ে সেখানে যদি জমি হয় তাহলে অনেকেরই লাভ। নদী যখনই মরে যায় সেটা সাথে সাথেই দখল হয়ে যায় এবং অন্য ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। ইটের ভাটাসহ অন্যান্য স্থাপনা বিভিন্ন এলাকার কৃষি ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছে। আর এসবের পেছনে রয়েছে বিভিন্ন করপোরেট স্বার্থ এবং মুনাফা সর্বোচ্চ হারে বৃদ্ধি করা। বিভিন্ন সমস্যার বিকল্প সমাধানও রয়েছে। যেমন, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ দলের সাথে কাজ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকল্প ব্যবস্থা সরকারের কাছে তুলে ধরে বলা হল, ২০৪১ সন পর্যন্ত যত পরিমাণ বিদ্যুৎ দরকার, ঠিক তত পরিমাণ বিদ্যুৎ দেওয়া সম্ভব; এজন্যে রূপপুর দরকার নাই, রামপাল দরকার নাই; সেই সাথে পরিবেশের ক্ষতির বিষয়টিও তুলে ধরা হল। বিকল্প ব্যবস্থায় বিদ্যুতের দামও কম পড়বে, খরচও কম পড়বে, সুন্দরবন বা প্রকৃতিও নষ্ট হবে না, তথা পরিবেশগত ঝুঁকি নেই। কিন্তু সেটার গ্রহণযোগ্যতা সরকারের কাছে না থাকার কারণ হল এখানে বড় আকারের বাজেট বা প্রকল্পের দরকার নেই। বিভিন্ন কোম্পানির যুক্ত থাকারও প্রয়োজন নেই, এখানে বিদেশী ঋণও দরকার নেই, সুতরাং প্রণোদনাও নাই। বাংলাদেশের অর্থনীতি তথা রাজনীতি যেভাবে যাচ্ছে তার সাথে বিকল্প প্রস্তাব সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কিন্তু বিকল্প প্রস্তাবে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে রক্ষা করার কথাই বলা হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে কৃষির জীববৈচিত্র্য এবং কৃষিকে রক্ষা করার যে পথ, সেই পথে যেতে হলেও বিদ্যুৎখাতে এবং জ্বালানিখাতে বিকল্প পথকে বেছে নিতে হবে। কিন্তু কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র করলে সামগ্রিক কৃষি, নদী, পানি, প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যাপক হুমকির মুখে পড়বে কিন্তু জিডিপি অনেক বাড়বে। জিডিপি'র সমীকরণ সাধারণত দুইভাবে দেখা হয়। কিন্তু জিডিপি হিসাব উপস্থাপনের সময় একটি অংশ দেখানো হয়, আরেকটা হয় না। অর্থাৎ কত আর্থিক আয় বাড়লো সেটা আমরা জানতে পারি, কিন্তু তার পেছনের খরচ জানতে পারি না, অর্থাৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি উপলব্ধি করা যায় না। সমাধানের বিষয়ে যদি ভাবতে হয় তাহলে প্রথমেই দরকার সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সেটার স্বীকৃতি।

উন্নয়ন দর্শনের প্রধান যে জায়গাটা, সেটাকে প্রশ্ন করার মত আইডেন্টিটিক অ্যাবিলিটি এবং কার্যাবলী বাড়াতে হবে। এরকম বিশেষজ্ঞ আছেন যারা আমাদের দেশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন, জলবায়ু ও পরিবেশ নিয়ে কাজ করছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবশগত এবং মৌলিক বিষয়গুলোতে সরকার বিরক্ত হবে বলে কিংবা বড় বড় কোম্পানি বিরক্ত হবে বলে তারা সেগুলো বলা বন্ধ রাখেন এবং চুপচাপ থাকেন। এ ধরনের বিশেষজ্ঞমহল দিয়ে আমাদের কোন কাজ হবে না।

সভাপ্রধানের বক্তব্য:

অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে অব্যাহতভাবে একটা মেটাবলিজম হচ্ছে। মানুষ প্রকৃতি থেকে নিচ্ছে, নিয়ে সেটিকে কিছুটা পরিবর্তিত করে

নিজের উপযোগী করে ইউজ ভ্যালু তৈরি করছে। সেটি মানুষের জীবনের মান বাড়াচ্ছে, আবার তার ফলে প্রকৃতির উপরও কিছুটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষ প্রকৃতির উপর কাজ করছে। প্রকৃতি আমাদের ফল দিচ্ছে, আমরা সেই ফল ভোগ করছি, বেঁচে থাকছি। আমরা ভেবেছিলাম যে, প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা নিতেই থাকবো, আমরা বাড়তেই থাকবো, আমাদের কোন সমস্যা হবে না। কিন্তু এখন এটা স্বীকৃত যে, প্রকৃতি এখন তার প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছে, যে কারণে এখন আমরা অনেক অপ্রত্যাশিত সমস্যার মধ্যে পড়ছি। আমরা কখনো ভাবিনি এই সমস্যাগুলো হতে পারে; যেমন, শীতকাল, গরমকাল কখন শুরু হবে, বন্যা কতটুকু হবে ইত্যাদি। সুতরাং এগুলো এখন নতুন সমস্যা। প্রকৃতি থেকে নেয়া অব্যাহত রেখে, আমাদের জীবন মান না কমিয়ে আমরা কি এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারব? আমরা সবকিছু খুব দ্রুত শেষ করে দিয়ে, আমাদের প্রজন্ম খুব ভালো থাকতে পারি। তবে, এক্ষেত্রে পরবর্তী প্রজন্মগুলো কিছুই পাবে না। তারা দূষিত বায়ু, পানি, মাটি, অর্থাৎ একটা দূষিত পৃথিবীর মধ্যে থাকবে। পরবর্তী প্রজন্মের কথা না ভেবে স্বার্থপরের মত চাইলে আমরা সব শেষ করতে পারি, কিন্তু সেটা আমাদের আদর্শ নয়। প্রকৃতিকে আমাদের একটা সুস্থায়ী মাত্রা দেয়া উচিত, যাতে আমরা যেই মাত্রায় আছি পরবর্তী প্রজন্ম সেই মাত্রায় থাকতে পারে এবং আরো বাড়াতে পারে। এটা একটা জটিল সমস্যা, যার দুটি দিক আছে। একটা দিক হল হিউম্যান ইন্সটিটিউটস। এখন পৃথিবীতে অনেকে একটা রায় দিতে চাচ্ছেন যে, মুনাফা, বাজার ও ব্যক্তি মালিকানা- এই ইনস্টিটিউশনগুলো হল বেস্ট। কিন্তু এসব ইনস্টিটিউশন আয়ের ক্ষেত্রে একচেটিয়া বাজার গড়ে তুলবে। ‘কনসেনট্রেশন অব ওয়েলথ’ খুবই বেড়ে যাবে, উৎপাদকের বৈচিত্র্য কমে যাবে। আরেকটি বিষয় হবে, যেহেতু এই একচেটিয়া বাজার খুব ন্যারো এবং ন্যারো বেসড, সুতরাং একচেটিয়া গোষ্ঠী ও দেশ অন্যের দিকে তাকাবে না; ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থে চলার কারণে কোথায় কী দূষণ হচ্ছে তারা সেটা লক্ষ্য করা হবে না, কারণ ব্যক্তিগত লাভ হচ্ছে কী হচ্ছে না সেটাই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। সামাজিকভাবে না দেখে দেখা হবে ব্যক্তিগতভাবে। সুতরাং ঐ ইনস্টিটিউটগুলোর মাধ্যমে আমরা সুস্থায়ী প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারবো না। আবার দেখা যাচ্ছে প্ল্যানিং, সোশ্যাল কন্ট্রোল, এগুলোকে চূড়ান্ত করেও সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং বলা যায় বিড়াল কালোও হতে পারে, বিড়াল সাদাও হতে পারে কিন্তু কোথায় কখন কোন বিড়ালটা ইঁদুর মারতে পারে এটা দেখতে হবে। এখানে একটা ‘আনবায়াসড অবজারবেশন অব সায়েন্স’ কাজে লাগবে। কিন্তু চূড়ান্ত রায়টা বিজ্ঞান এবং কৃষককেই দিতে হবে। এক্ষেত্রে কৃষকের কাছে সব বিকল্পগুলো উন্মোচন করে দিয়ে তার গণতান্ত্রিক চয়েসকে মূল্য দিতে হবে। বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে, সে কতগুলো পোটেনসিয়াল রিপ্ৰোডিউসেবল সমাধান দেয়। যেটা চর্চা করে সত্য-মিথ্যা যাচাই করা যায়। সুতরাং, দেখতে হবে, ঐতিহ্যগত সমাধান এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সংযোগে কী রেজাল্ট দিচ্ছে। সেই কাজটা রুলিং ক্লাস করবে না। সেটা করতে হবে সবাইকে। শুধু করলে হবে না, সেটা নিয়ে কৃষকের কাছে যেতে হবে এবং কৃষক মত দিলে তাকে নিয়ে রাষ্ট্রের বা রুলিং ক্লাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে।

যেহেতু কাঠামোগত পদ্ধতির একটা পাওয়ার আছে, একটা আকর্ষণ আছে, তারাই ভোট পায়, বাম পন্থীরা পায় না। সুতরাং সেই জায়গাটাতে ঠিক না করলে এটা সম্ভব না। কোন সমাধান ঠিক সেটা কেউই ঠিক করতে পারবে না। ঐ সমাধান এর ভোক্তা বা ঐ সমাধান এর ফলাফল যারা ভোগ করবে সে সেটি ঠিক করবে। সুতরাং তার কাছে সব অপশনসহ সেটা পৌঁছে দিতে হবে, সে ভুল করলেও তাকে চাপিয়ে না দিয়ে সিদ্ধান্ত তার অভিজ্ঞতার আলোকে তাকেই নিতে দিতে হবে।

দ্বিতীয় সেশন:

জলবায়ুর পরিবর্তন ও কৃষি নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির ধারণা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, বাধাসমূহ এবং সেসব বাধা উত্তরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

ড. মাহফুজুল হক, অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি

ড. মাহফুজুল হক বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিনিয়ত হচ্ছে, এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং বাড়ছে। এক্ষেত্রে আমাদের অ্যাডাপ্টেশন'এ যেতে হবে। আমাদের ভাবতে হবে আমরা লবণসহিষ্ণু, বন্যাসহিষ্ণু কিংবা খরাসহিষ্ণু কৃষিতে যাবো কিনা। যেহেতু দেশেই থাকতে হবে এবং



ড. মাহফুজুল হক

অ্যাডাপ্টেশন'এ যেতে হবে, সেক্ষেত্রে কিভাবে করতে হবে এটাই বড় চ্যালেঞ্জ। সুতরাং সেই ধারাবাহিকতায় জেনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বারা বিভিন্ন ফসল আসা শুরু করলো। যেমন: লবণসহিষ্ণু ধান, বন্যা সহিষ্ণু ধান, যেটা বন্যার পানির বৃদ্ধির সাথে সাথে লম্বা হতে থাকে। এছাড়াও বলা হচ্ছে হাইড্রোপোনিক বা ভাসমান চাষ পদ্ধতির কথা, যেটাও নতুন আবিষ্কার হিসেবে দাবি করা হল। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হল পানির সাথে সাথে ধানের ডগা বৃদ্ধি কিংবা ভাসমান চাষ পদ্ধতি এগুলো কৃষকেরা অনেক আগে থেকেই জানে। এগুলো নতুন কোন আবিষ্কার

নয়। আমাদের লোকজ জ্ঞান বা ইন্ডিজেনাস নলেজ'এ এটা রয়েছে। কিন্তু আমরা লোকজ জ্ঞানকে স্বীকৃতি বা ক্রেডিট দিতে চাই না। যাই হোক, ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচারকে (সিএসএ- জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি) প্রথমে আমার খুব পজিটিভ মনে হলেও, পরবর্তীতে গভীরভাবে পড়াশুনার পর বুঝতে পারলাম এটা আসলে ৬০ দশকের সবুজ বিপ্লবের মতই। তখন এই বিপ্লবের নামে হাইব্রিড ব্যবহার শুরু হয়েছিল। ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার সমাধান না, আমাদের এগ্রোইকোলজি নিয়ে ভাবতে হবে। আমাদের সামগ্রিক কৃষি, মৎস্য, পানি নীতিতে প্রতিবেশের কথা বলা হয়নি, সেখানে উৎপাদন করাটাই প্রাধান্য পেয়েছে। এগ্রো-ইকোলজিকে মূল ধারায় না আনতে পারলে কৃষককে চয়েজ দিয়ে লাভ হবে না, তাকে পরিবেশের কথা বলেও লাভ নেই। সে বলবে পরিবেশ তো সরকারের ব্যাপার, সে ২২ মণ ধান পাচ্ছে এটাই তার কাছে বড় ব্যাপার, কারণ স্থানীয় বীজের ব্যবহারের ফলে সে হয়ত পাবে ১০ মণ। কৃষকরা এখন অনেক আধুনিক হয়ে গেছে। যেমন গাইবান্ধায় এখন গরু বা লাঙ্গল নেই, ট্রাক্টর চলে এসেছে। এছাড়া এসেছে জাপানি মেশিন, যেগুলো দিয়ে প্ল্যান্টেশন, হারভেস্টিং'এর কাজ করা হচ্ছে। আবার অনেক কৃষকই ঢাকা গিয়ে বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে যার ফলে কৃষিতে লোকবলের প্রচণ্ড অভাব দেখা দিয়েছে।

ভূপৃষ্ঠের পানির বদলে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহারের কারণ প্রসঙ্গে কৃষককে জিজ্ঞেস করায় উত্তর দিয়েছিল যে, ৪,০০০ টাকা দিয়ে একটি মেশিন দিয়ে পানি তোলা যায়, কিন্তু নদী থেকে পানি তোলা ব্যয়বহুল এবং কষ্টসাধ্য। সুতরাং কৃষকদের চয়েস দিয়ে কোন লাভ নাই। পলিসি লেভেল

থেকে ট্রাস্ট থাকা খুবই জরুরী। জুম চাষীরা পার্বত্য অঞ্চলে চাষ করে অনেক ভালো ফসল পেত। বিভিন্ন কারণে ও জনসংখ্যা বেড়ে স্থান সংকুলান না হওয়ায় এখন সেই ফসল দিয়ে তারা ৮ মাসও চলতে পারে না। সুতরাং তারাও হাইব্রিড, কেমিক্যাল ব্যবহারে উৎসাহিত হচ্ছে। সুতরাং এসব সমস্যা দূরীকরণে যারা কাজ করবেন তাদের এগুলোও ভাবতে হবে। পলিটিশিয়ানদের ব্যাপারে ডাউট থেকে যায়, কারণ দে গো বাই দ্যা উইন্ড (বাতাস যেদিকে যায় তারাও সেদিকে যায়)। কৃষি বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদরা সত্যিকারের পরিবর্তন আনতে পারবে। দেখা যায় তাদের অনেকে ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার-কে সমর্থন দিয়ে থাকেন। সুতরাং একাডেমিশিয়ানদের সিলেবাসের পরিবর্তনের ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে। বিজনেস কমিউনিটি আছে, কিন্তু তারা তো মুনাফামুখী। কৃষকরা উৎসাহিত হয়ে পরিবেশ ও দেশের জন্যে নিজে থেকে কিছু করবে এরকম আশা করা যায় না। সুতরাং এ বিষয়গুলো বিরাট চ্যালেঞ্জ। পলিসি লেভেলের সমর্থন ছাড়া কৃষিতে পরিবেশের বিষয় নিয়ে আসা খুবই কঠিন কাজ।

মনোরঞ্জন মণ্ডল, আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট-এর পানি বিজ্ঞানী

মনোরঞ্জন মণ্ডল বলেন, কিছু সুবিধাবাদী লোকজন থাকলেও এখনও বাংলাদেশে অনেক কৃষি বিজ্ঞানি আছেন যারা প্রো-বাংলাদেশ, প্রো-ফার্মার। যারা যথেষ্ট দেশপ্রেম নিয়েই কৃষক এবং কৃষি নিয়ে কাজ করেন। ২০২১ সনে বাংলাদেশের কোস্টাল এরিয়া তলিয়ে যাবে কথাটি সত্য নয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ওয়াপদা বাধ নির্মাণের ফলে দক্ষিণাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ লোক বেঁচে গিয়েছে। এজন্য এই বোর্ড ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। যদিও তারা পরবর্তীতে সেটার রক্ষণাবেক্ষণ করেনি; এটা তাদের ত্রুটি। এছাড়া কৃষকের কাছে বীজ নেই এই কথাও সত্য নয়। ব্রি এবং বিএডিসি অনেক বীজ উদ্ভাবন করেছে, যেগুলো তারা রাখতে পারে। ১০% বীজ বাইরে থেকে কোম্পানিরা আমদানি করে, ৯০% বীজ কৃষক রাখতে পারে। তবে কৃষক বীজ চেঞ্জ করে। এখন তাদের শেখানো হয়েছে যে বীজ পরিবর্তন না করলে বীজের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। কৃষকদের সাথে তাদের নিজস্ব জ্ঞান, জমি, ভূমি, পানি সহ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মত বিনিময় করা হয়, তাদের বিভিন্ন অপশন দেয়া হয়। দেখা যায় অন্যান্য সবার মত কৃষকরাও লাভ চায়। তবে যুবক কৃষক কৃষিতে কমে গেছে। লোকবলের অভাবেই কৃষককে যন্ত্র ব্যবহার করতে দেয়া হয়েছে। কোন কৃষকই চায়না তার সন্তান কৃষক হোক। তাদের পুষ্টি বিষয়েও সচেতন করা হচ্ছে। সয়াবিন এর বদলে সূর্যমুখী তেল খাওয়ার কথা বলা হচ্ছে, যে সূর্যমুখী গাছ এক সপ্তাহ জলাবদ্ধ জমিতে বেঁচে থাকতে পারে।

সাফিয়া আজিজ, প্রাকৃতিক কৃষি

প্রাকৃতিক কৃষি'র কর্মী সাফিয়া আজিজ বলেন, রাসায়নিক উপাদান ছাড়া আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রাকৃতিক উপায়ে কৃষিকাজ করে এবং এভাবে উৎপাদিত ফসল বিক্রির জন্য মোহাম্মদপুরে একটি আউটলেট রয়েছে। তবে রাসায়নিক উপাদান ছাড়া চাষের ফলে উৎপাদিত পণ্যের দাম বেশি এবং চাকচিক্য কম। তাই অনেক সময় ভোক্তারা ফসল কিনতে চাননা। এক্ষেত্রে ক্রেতা বা ভোক্তাদের মানসিকতা পরিবর্তন করা জরুরী এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোনটাকে



অগ্রাধিকার দেওয়া হবে- বিষমুক্ত ফসলকে নাকি চকচকে বিষাক্ত ফসলকে। এছাড়া প্রাকৃতিক উপায়ে চাষের ফল বা সবজি সাধারণত নির্দিষ্ট মৌসুমে পাওয়া যায়। কিন্তু সুপারশপে আবার এসব ফল বা সবজি বারো মাসই পাওয়া যায়, কারণ রাসায়নিক উপকরণ দিয়ে চাষ করা হয়। আমাদের এখানে প্রাকৃতিক উপায়ে চাষ করে কৃষকরা চাহিদা অনুযায়ী যোগান দিতে পারছে না। এছাড়া আমাদেরকে একটু বেশি দাম দিয়ে কিনতে হয়, আর ফসল কম হওয়ার কারণে পরিবহন খরচও বেশি পড়ে। সব মিলিয়ে ফসলের দাম একটু বেড়ে যায়, যার কারণে অনেক সময় ভোক্তারা অসন্তুষ্ট বা নিরুৎসাহী হন। এজন্য সকলকে কাজ করতে হবে, যেন কৃষক উৎসাহিত হয় ও বিষমুক্ত চাষের প্রসার বৃদ্ধি হয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে বাড়ির পাশে, ছাদে, বারান্দায়, পতিত জমি যেখানেই হোক চাষের উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়া কৃষককে সঠিক তথ্য প্রদান করতে হবে, যাতে পুরো ফসল উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিষয়ে সে স্বচ্ছ জ্ঞান লাভ করতে পারে।

পিনাস আক্তার, অক্সফাম

অক্সফামের একটি প্রজেক্টে ক্লাইমেট চেঞ্জ, এগ্রিকালচার এবং উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট এ তিনটি বিষয় যুক্ত করে কাজ করা হচ্ছে। এ প্রজেক্টের আওতায় যে কোনভাবে কৃষির সাথে যুক্ত এমন ৩০০ জন নারীকে ৩০০টি স্মার্ট ফোন সরবরাহ করা হয়েছে। যাতে তারা সেখান থেকে কৃষি বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। গ্রামাঞ্চলে স্মার্ট ফোন অনেক দেখা গেলেও সেক্ষেত্রে নারীরা অনেক পিছিয়ে। সুতরাং ব্যবহার বিধি না জেনে তাদের পক্ষে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি খুবই কঠিন কাজ ছিল। এক্ষেত্রে তাদেরকে উপযুক্ত



পিনাস আক্তার

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয় যাতে তারা ব্যবহার করে সেটা কাজে লাগাতে সক্ষম হয়। যদিও ১৬ কোটি মানুষের দেশের কৃষিতে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে, তারপরেও অন্তত ৩০০ প্রান্তিক নারী কৃষক কৃষি কাজের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের জীবনমান ও কৃষি বিষয়ক সমস্যা সমাধানে সক্ষম হচ্ছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রজেক্ট প্রশংসার দাবীদার। প্রজেক্টটি শুরু হয়েছে ২০১৫ সনে, আর শেষ হবে ২০১৯ সনে। কৃষক, সাধারণ মানুষ এবং কর্পোরেট, কৃষিতে এই তিনটি শ্রেণী সম্পর্কিত। বলা হচ্ছে, সকল ভিকটিম হচ্ছে কৃষক, এবং তার জন্য দায়ী করপোরেটরা, আর সাধারণ মানুষের কিছুই করার নেই। আমরা তাকিয়ে আছি অন্যের দিকে, কিন্তু নিজেরা উদ্যোগী হচ্ছি না, এবং সমন্বয়হীনভাবেই সব কিছু করছি। এ প্রজেক্টের আওতায় আইসিটি মিনিস্ট্রির সাথে কোলাবরেশন করা হয়েছে। কৃষিতে স্থানীয়ভাবে যেসব সরকারি সংস্থা সাথে কাজ করে, তাদের সাথে কোলাবরেশন করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তাদের সাথে নারী কৃষকদের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করানো হয়েছে। এছাড়া ন্যাশনাল লেবেল এর কোন প্রোগ্রামে যেখানে মন্ত্রী বা প্রভাবশালী কেউ থাকে, সেখানেও ঐ স্থানীয় প্রতিনিধিদের রাখা হয়েছে, যাতে পারস্পরিক মত বিনিময়ের সুযোগ থাকে।

**এবাদুল্লা খান, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়**

মহেশখালীতে এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড ট্রান্সফারমেশন অর্থাৎ চাষ যোগ্য জমির পরিবর্তন বিষয়ে কাজের মাধ্যমে দেখা যায় যে, একটি কৃষকের পরিবারের সকল সদস্য এক সময় এক সাথেই ছিল, কিন্তু সন্তান বড় হয়ে যখন পরিবার গঠন করে তারা তখন অন্য বাড়ি তৈরি করে। যেটা হয়তো সবচেয়ে উর্বর চাষযোগ্য জমি সেটিই সেটেলমেন্টে ব্যবহৃত হয়। যদিও বিকল্প অপশন ছিল, অর্থাৎ যেখানে চাষ হয় না, সেখানে যেতে পারতো। কৃষকরা হাই ল্যান্ড কিংবা লো ল্যান্ড সম্পর্কে জানে না এবং চয়েজ করতেও পারে না। এভাবে উর্বর চাষ যোগ্য জমি নষ্ট হচ্ছে। পাশাপাশি এর সাথে সম্পর্কিত জীববৈচিত্র্যও বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এর জন্য দরকার ছিল একটি যথাযথ ভূমি ব্যবহার নীতি, যেখানে দিক নির্দেশনা থাকতো যে ভূমি বন্দোবস্ত কোথায় করা যাবে।



এবাদুল্লা খান

আমিনুল ইসলাম, এডিটর, দা রিফ্লেক্টর



আমিনুল ইসলাম

কৃষকদের সচেতন এবং সময় উপযোগী প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং বিভিন্ন আলোচনায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি পলিসি হতে হবে সময় উপযোগী এবং সেগুলোর দ্রুত কার্যকর হওয়া দরকার। শিক্ষিত ছেলে/মেয়েদের কৃষির সাথে যুক্ত করতে হবে। কৃষকের জন্যে উপযুক্ত মার্কেটিং সিস্টেম থাকতে হবে। বিভিন্ন ইউনিয়ন, কিংবা উপজেলায় প্রিজারভেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সরকার কর্তৃক কৃষকদের জন্য প্রেরিত তথ্য এবং সেবা নিশ্চিত করাও জরুরী।

সিমা দাস শিমু, উবিনিগ

আমরা ‘নয়াকৃষি আন্দোলন’ করছি। এটি প্রাণ-বৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি ব্যবস্থা। এটা শুধু ধান আর সবজি চাষ বিষয়ে না, এটি একটি সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থা, যার সাথে পশুপাখি, মাছ এবং অন্যান্য প্রাণের বৈচিত্র্য থাকবে। নয়া কৃষির কর্ম পদ্ধতিতে ১০টি নীতি রয়েছে, যার প্রথম নীতি হল, বাজারের বীজ ব্যবহার করা যাবে না। আরেকটি শর্ত হচ্ছে বিষ ব্যবহার করা যাবে না। কারণ বিষের নাই বাছ বিছার, মারে প্রাণ নির্বিচার। কম হোক আর বেশি হোক বিষ কিন্তু বিষই। এরপর ডিপ-টিউবওয়েলের পানি তোলা যাবে না। ১৯৮৮ সালের দিকে নয়া কৃষি আন্দোলন যখন শুরু হয়েছিল, কৃষকরা তখন বললো তাদের কাছে বীজ নাই, দেশী বীজ লাগবে। দেশী বীজ ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে, এতে কৃষক অনেক কিছু ক্রয় করা থেকে বেঁচে যাবে বা

উপকরণ খরচ লাগবে না। কিন্তু আধুনিক কৃষি হল একটি প্যাকেজের মত অর্থাৎ বীজ কিনতে হয় বাইরে থেকে, পানি দিতে হবে এবং সাথে রাসায়নিক সার দিতে হবে। সার দিলেই পোকা আসবে, তখন কীটনাশক, বালাইনাশক কিনতে হবে। যাই হোক, বিভিন্ন জায়গা থেকে বীজ সংগ্রহের পরে কিভাবে সেটা ব্যবহার করতে হবে সে ব্যাপারে কৃষকদের দিক নির্দেশনা দেয়া হয় এবং জৈব সার প্রস্তুতপ্রণালী শেখানো হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বীজ সুরক্ষিত রাখার জন্য নয়াকৃষি বীজঘর করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকায় আউটলেট আছে যেখানে কৃষকদের ফসল আসার সাথে সাথেই বিক্রি হয়ে যায়। ফসল বিষমুক্ত হওয়ায় কৃষক দামও বেশি পায়। কিন্তু বিভিন্ন কোম্পানি কৃষকদের সবসময় বিভিন্ন লোভ দেখাতে থাকে। যদিও নয়া কৃষির সাথে সম্পৃক্ত কৃষকেরা তাতে সাড়া দেয়নি। এখন আবার ভিটামিন-এ'র কথা বলে গোল্ডেন রাইস আসছে। গোল্ডেন রাইস চাষ করা মানে কোম্পানিকে সুবিধা দেয়া, কারণ ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ প্রচুর খাবার আমাদের রয়েছে। সুতরাং আমাদের গোল্ডেন রাইস এর কথা বলে কোম্পানির ব্যবসা বন্ধ করতে হবে। নয়াকৃষির প্রচার বা পাবলিসিটি নাই, শুরুতে অনেকেই এটা প্রত্যাখান করেছিল, কিন্তু মহিলা কৃষকরা আগ্রহী ছিল। পরবর্তীতে অনেক কৃষক যুক্ত হল। এখন প্রধান সমস্যা হল অতিরিক্ত বন্যা, অতিরিক্ত খরা, বীজ সংরক্ষণ ইত্যাদি।

দারুল ইসলাম, উন্নয়ন ধারা

সুস্থায়ী অর্গানিক কৃষি বা নিরাপদ কৃষির সাথে সম্পৃক্ত থেকে কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা এবং সমাধান পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা গেছে, আমাদের কৃষি এবং কৃষক দুইই মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে আছে। অর্গানিক কৃষির উৎপাদন তুলনামূলকভাবে কম এবং তার চেয়ে সমস্যার বিষয় হল বাজার দর। বিকল্প বাজার সৃষ্টি করা ছাড়া কোনভাবেই এগুলোর সমাধান সম্ভব নয়। কৃষক সংগঠনও জরুরী, যেখানে ২০-৫০ জনের সংঘবদ্ধ কৃষক দল থাকবে এবং ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিক্রয় করবে। কৃষকরা ফসল বিক্রির ব্যবস্থা ও অনান্য দাম পেলে প্রাকৃতিক কৃষিতে উৎসাহিত হবে। এজন্য প্রয়োজন স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় বিকল্প বাজার সৃষ্টি করা। উন্নয়ন ধারা ঝিনাইদহ ও ঢাকায় আউটলেট দিয়েছে। ঢাকাতে দৈনিক প্রায় দেড় লাখ টাকার পণ্য আসে এবং বিক্রিও হচ্ছে। আগামিতে আইটি সেক্টর এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার বা বায়োটেকনোলজির একটা বড় বিপ্লব হতে পারে, যেটা কৃষিকে আরও বেশি কোম্পানির আওতায় নিয়ে যেতে পারে।



দারুল ইসলাম

ড. অনীল দাস, এফএও, বাংলাদেশ

সমস্যা সমাধানের কথা কাকে বলা হচ্ছে? এটি বাস্তবায়নের উপায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঘটনা প্রসঙ্গে বলা যায় দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে দাবি করা হয় দেশের জন্য অনেক কিছু করা হয়েছে। যখন যমুনা সেতু তৈরি হয় বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়াররা সেখানে দর্শক ছিল। ৩০ বছর পরে পদ্মা সেতু নির্মাণের সময়ও তাই। সর্দি-কাশি ছাড়া কোন রোগ হলেই ইন্ডিয়া যাওয়া হয়। যদিও আমাদের সবচেয়ে মেধাবীরাই ডাক্তারী পড়ে। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে যদিও

জমি বাড়েনি বরং কমেছে। জনসংখ্যা ছিল সাত কোটি এখন ১৬ কোটির বেশি তার পরেও কৃষি এবং কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই এই জায়গাটা তৈরি করতে অবদান রেখেছে বলে আমরা বলতে পারি আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। এটি আমাদের দেশের কৃষি গবেষক ও সম্প্রসারণ কর্মীদের অবদান।

ড. মুজিবুর রহমান খান, আইইউবিএটি

আইইউবিএটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘বিএসসি ইন এগ্রিকালচার’ প্রোগ্রামে ছাত্রদের জলবায়ু পরিবর্তন, সুস্থায়ী ডেভেলপমেন্ট বিষয়গুলো পড়ানো হয়। এখানে দুটি বিষয় বারবার আলোচিত হচ্ছে সেগুলো হল, হাইব্রিড এবং এইচওয়াইভি- হাই ইন্ডিং ভ্যারাইটি (উফসি)। হাইব্রিড বাংলাদেশে ২% এর বেশি না। কিন্তু এইচওয়াইভি ধান প্রোডাকশন বন্ধ করে দিলে ধান উৎপাদনে আমাদের অবস্থান হঠাৎ করে নীচে নেমে যাবে। তাহলে কি আমরা জিএমও-তে যাব? না, আমাদের জিএমও-তে যাওয়া ঠিক হবে না। এই উপমহাদেশে বাংলাদেশই প্রথম বিটি বেগুন, যেটি জিএমও, অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অথচ ভারত তাদের বিএসএফ-কে সতর্কবার্তা দিয়েছে, যাতে এটা তাদের দেশে চোরাচালান না হয়। আবার গোল্ডেন রাইস ইউএসএ এবং নিউজিল্যান্ডে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। অন্য ফসলে ভিটামিন-এ রান্না করার সময়ে চলে যায়, কিন্তু গোল্ডেন রাইস’র ক্ষেত্রে সেটা হয় না। ৩০০০ শিশু প্রতি বছর অন্ধ হয়ে যাচ্ছে ভিটামিন-এ’র অভাবে। সুতরাং এটা নিয়ে আরো গবেষণা প্রয়োজন; গবেষণা করে ভাল ফল পাওয়া গেলেই কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

আনিসুর রহমান, ওয়েভ ফাউন্ডেশন

বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব হয়তো আমরা সম্পূর্ণরূপে এড়াতে পারবো না। এখানে নীতি বাস্তবায়ন পর্যায়ে যারা আছেন তারা এ বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, নলেজ এক্সচেঞ্জ এবং প্রযুক্তি ট্রান্সফার করার মাইন্ডসেট থাকতে হবে। কিন্তু এটা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার কাজটা আরো জোরদার করতে হবে। আমাদের খুব বড় সমস্যা হচ্ছে কর্মসংস্থান, এবং তা বৃদ্ধির জন্য এগ্রিকালচার সেক্টরে খাদ্য প্রসেসিং-এ যুবসমাজের অংশগ্রহণ খুবই প্রয়োজন। কৃষকদের জীবন মানের উন্নতি করতে হলে তাদের শিক্ষিত ও সচেতন করার বিকল্প কিছু নাই। ওয়েভ ফাউন্ডেশন নীতিগতভাবে হাইব্রিড ও জিএমও এর বিপক্ষে অবস্থান করে। এছাড়া জলবায়ু এডাপ্টেশন এর জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তি ট্রান্সফার করা হয়। যে কোন ইন্টারভেনশন এর আগে উচিত এনভাইরনমেন্ট অ্যাসেসমেন্টটা ঠিকঠাক করা। এছাড়া সবার সম্পৃক্ততা এবং সমন্বয়ও খুব জরুরী।

তানভীর শাহিল, গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক

নিবিড় পদ্ধতিতে ধান চাষ বা এসআরআই-তে যুক্ত থাকার কারণে কৃষকদের সাথে নিবিড়ভাবে মেশার সুযোগ হয়। আমাদের কৃষকদের মধ্যে বহু আগে থেকেই ডেমোনস্ট্রেশন প্র্যাকটিসটা খুব বেশি বদ্ধমূল হয়ে গেছে। ডেমোনস্ট্রেশন ছাড়া কোন কিছু তারা বিশ্বাস করতে চায় না। একইভাবে বিভিন্ন কোম্পানি বীজ/সার/বিষ নিয়ে কৃষকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে এটাও তারা জানে; এই রাজনীতিটাও তারা বুঝে। আবার ডেভেলপমেন্ট অরগানাইজেশন এর পক্ষ নিয়ে কৃষকের কাছে গেলেও তারা সাদরে গ্রহণ করে, ব্যাপারটা সেরকম না। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে কৃষককে জৈবসার প্রস্তুত প্রণালী শেখানো হয়, কিন্তু সে জৈব সার ব্যবহার করতে পারছে না, কারণ সে অন্য একটি প্র্যাকটিস করেছে এতদিন। এছাড়া ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে কৃষকদের মাঝে এখন প্রান্তিক কৃষক বা বর্গা চাষী কম। এখন হয়ে গেছে লীজ সিস্টেম।

অর্থাৎ যদি কোন কৃষক দুই বছরের জন্যেও জমি লিজ নেয় সে ঐখানে সর্বোচ্চ মুনাফাই করতে চাইবে। সুতরাং লাভের মানসিকতা তার মধ্যেও প্রবেশ করেছে। ট্রেনিং কর্মসূচির অংশ হিসেবে তাদের মধ্যে সার্টিফিকেট দেয়া হয়। মজার ব্যাপার হল সেই কারণে তাদের মধ্যে এক ধরনের সাংস্কৃতিক পুঁজি সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিগত আত্মহ থেকে পর্যালোচনা করে দেখা যায় এ সাংস্কৃতিক পুঁজিকে ব্যবহার করে বা কাজে লাগিয়ে কৃষকদের জন্য ভালো কিছু করা সম্ভব। সংগঠিত শক্তি না থাকার কারণে তারা সরকারি সকল সুবিধা সঠিকভাবে পায় না। সেই জন্য কৃষক সংগঠন খুবই জরুরী বিষয়। সরকার কর্তৃক প্রেরিত সেচের পাম্পগুলো নির্দিষ্ট কিছু লোকের কাছে থাকে, যারা সেগুলোর জন্যে বিভিন্ন রকম আর্থিক সুবিধা নিয়ে থাকে। জৈব সারের অন্যতম উৎস হল গরুর গোবর, কিন্তু বর্তমানে গরু পালন কমে গেছে। সে বিষয়টাও দেখতে হবে। এজন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে থেকে যেমন কাজ করতে হবে, সেই সাথে গড়ে তুলতে হবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

মো: ইফতেখার আলী, রিইব

বাংলাদেশের ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট এখন পর্যন্ত ৮০টি'র বেশি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। তবে গ্রামে গিয়ে আমরা দেখেছি, সেখানে মাত্র কয়েকটি জাত জনপ্রিয় হয়েছে বা টিকে গেছে। এগুলো টিকে যাওয়ার কারণ হচ্ছে কৃষকরা ঐ জাতগুলো পছন্দ করেছিলেন বা উপযোগী মনে করেছিলেন। ঠিক একই কারণে আমাদের স্থানীয় জাতগুলো হাজার হাজার বছর ধরে টিকে ছিল এবং এখনও কিছু জাত টিকে আছে অর্থাৎ কৃষকরা সেসব জাতগুলোকে উপযোগী মনে করেন কারণ এসব স্থানীয় জাতগুলোর মধ্যে কোন জাত বন্যাসহিষ্ণু, কোনটা খরায় হয়, আবার কোনটা লবণাক্ত জমিতেও হয়। কোনটা উঁচু জমির, কোনটা নিচু জমির। আবার কোনটার স্বাদ ভালো, কোনটা শরীরের জন্য ভালো, কোনটা গর্ভবতী মা খায়, কোনটা অসুস্থ হলে খায়। এছাড়া উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে এগুলো এখানকার ইকোসিস্টেমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, দুর্যোগসহনশীল, চাষ করতে কোন সিনথেটিক সার বা বিষ প্রয়োজন নেই, উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে এবং বীজের উপর কৃষকের অধিকার বজায় থাকে। কৃষকের কাছে ধান বা অন্য ফসলের কয়েকটি জাত থাকার উপকারিতা আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করেছে। সায়েন্টিফিক পেপার থেকে জানা যায়, একই জমিতে ফসলের একটি জাত চাষ করা হলে যত বালাই (শত্রু পোকা, রোগ প্রভৃতি) হয়, সেখানে ঐ ফসলের একাধিক জাতের চাষ করা হলে বালাই কম হয়।



মো: ইফতেখার আলী

রিইব যখন কৃষকদের সাথে কাজ শুরু করে, তখন কৃষকরা তাদের প্রধান সমস্যা হিসেবে বলেছিলেন যে, দীর্ঘদিন ধরে জমিতে সার, বিষ দিচ্ছি, ফলে জমি নষ্ট হয়ে গেছে। জমির মাটির শক্তি নাই, কোন মাকড়সা-টিকটিকি-প্রজাপতি-বন্ধু পোকা নাই, পাখি নাই। তখন তাদের সাথে এগ্রো-ইকোলজি বা জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষের কৌশলগুলো শেয়ার করা হয়। তারা বলেছিলেন বীজ সংকটের কথা। বিভিন্ন স্থান থেকে বীজ সংগ্রহের পরে তারা সেসব

যাচাই-বাছাই করে বীজের উপযোগিতা পরীক্ষা করে দেখছেন এবং চাষের ক্ষেত্রে ইকোসিস্টেমে জীববৈচিত্র্য বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। এধরনের কাজ করতে গিয়ে কৃষি কর্মকর্তা ও অন্যান্য কৃষকদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়তে হয়। তাদের প্রশ্ন, এভাবে স্থানীয় জাতের শস্য চাষ করে কতজনকে খাওয়ানো যাবে, যেখানে উৎপাদন তুলনামূলকভাবে কম। তবে অনেকে উৎসাহও দিয়েছেন। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, আধুনিক কৃষির দেশ আমেরিকাতে কৃষক একটি কৃষি পণ্য বিক্রি করে ১০০ টাকার মধ্যে পায় ১৭ টাকা, বাকী ৮৩ টাকা পায় ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলো। অর্থাৎ বাংলাদেশের কৃষককে আধুনিক ও শিক্ষিত করে তোলা গেলেও, সে যদি কোম্পানি নির্ভর কৃষি করে তাহলে ১০০ টাকার মধ্যে ঐ ১৭ টাকাই পাবে, বাকী ৮৩ টাকা কোম্পানি নিয়ে যাবে। যাই হোক কৃষকরা জৈব কৃষির আরও কৌশল শিখতে চাচ্ছেন। সম্প্রতি কম সম্পদ ব্যবহার করে ধান চাষ করার এসআরআই পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। অথচ খনার বচনে এই পদ্ধতির কথা উল্লেখ আছে “কোন পাতলা ডাগর গুছি, লক্ষী বলেন ঐখানে আছি”। জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে কৃষকরাও একমত হয়েছেন যে, আমাদের এই স্থানীয় জ্ঞান এবং বীজগুলো টিকিয়ে রাখতে হবে। আর বীজ যদি একবার হারিয়ে যায় তাহলে সেটা ফিরে পাওয়া যায় না। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ বলছে, স্থানীয় ইকোসিস্টেমগুলো ফিরিয়ে আনতে। অর্থাৎ তাদের কথা শুনলে সিনথেটিক বা রাসায়নিক কৃষি উপকরণ ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।

আবু তালেব হালিম, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতির বিষয়ে দেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে কৃষক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন আলোচনা করছি আমরা। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হলেও বিভিন্নভাবে নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এজন্য দরকার সঠিক উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনা। সরকারকে সঠিক পরিকল্পনা নিতে হবে যাতে কৃষক প্রয়োজনীয় পানি পায়। কৃষকদের সহযোগিতা করলে তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে।



আবু তালেব হালিম

কাজী মো: জামিরুল ইসলাম, পিজেএস

কৃষক প্রথমেই কিছু বিশ্বাস করতে চায় না, পরীক্ষা করে দেখতে চায়। জৈবসার ব্যবহারে উপকৃত হওয়ার পর তারা কিছুটা বিশ্বাস করেছে। প্রথম বছরের পর দ্বিতীয় বছরে তারা জৈব সার বাজারে বিক্রি করতে গেলে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। সার ডিলাররা ভেটো দেয়; এ সারের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং জমির জন্য কতটুকু উপযুক্ত তার বিশদ বিবরণ উপস্থাপনের জন্য বলা হয়। এগুলো না করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়। এরপর থেকে কৃষকরা বাজারে না নিয়ে খুচরা বিক্রি করে। জৈব সারের ব্যবহার বাড়তে হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা দরকার। কৃষকরা স্বাধীন না, তারা আড়তদারদের কাছে চুক্তিবদ্ধ। আড়তদাররা কৃষকদের বেশি টাকার বিনিময়ে বাধ্য করে তাদের কথা শুনতে। কৃষকের কাছে পুঁজি নেই। তাদের ঋণেরও অভাব, কারণ ব্যাংক থেকেও তারা সহজে ঋণ পাচ্ছে না। কৃষকরা বস্ত্রত কামলা, বিশেষ করে প্রান্তিক কৃষক, যারা অন্যের জমিতে চাষাবাদ করে। এ ব্যাপারে ব্যাপক সচেতনতা বাড়ানো জরুরী।

সচেতনতা কর্মসূচির অংশ হিসেবে পথ নাটক, আলোচনা, প্রশিক্ষণ এবং থ্রিডি স্কুল করতে গিয়েও নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ইস্যু তৈরির চেষ্টাও করা হয়।

বিনোদ কষ্টি, রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং (আরএলএস), নয়াদিল্লী, ভারত

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভারতের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং-এর দিল্লী অফিসের প্রোগ্রাম ম্যানেজার, বিনোদ কষ্টি বলেন জলবায়ু পরিবর্তন নিশ্চিতভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার ফলাফল। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের সমাধানটাও এই পুঁজিবাদী ‘উৎপাদন ব্যবস্থা’ বা ‘উন্নয়ন কৌশলের’ মধ্যেই খুঁজতে হবে। পুঁজিবাদ আমাদের চিন্তা-ভাবনা এবং জ্ঞানের উপর আঘাত হানছে। পুঁজিবাদ সব সময়ই চাইবে আমরা যেন ঐক্যবদ্ধ না হতে পারি, আমরা যেন এমন তথ্য বা জ্ঞান না পাই যার ফলে আমাদের জীবন আরও সুন্দর হতে পারে। পুঁজিবাদ চায়, আমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে থাকি, তর্ক-বিতর্ক করতে থাকি। যেমন এরকম তর্কের একটা বিষয় হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ভালো, না আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ভালো। আসলে এগুলো হচ্ছে বড় খেলার একটা অংশ মাত্র। তারা চায় আমরা এসব তর্ক-বিতর্কে ব্যস্ত থাকি যাতে ওরা পুঁজিটা বা লাভটা নিয়ে চলে যেতে পারে। পুঁজিবাদ এমনকি জৈব কৃষিকেও উৎসাহ যোগাচ্ছে, জৈব বালাইনাশক বিক্রি শুরু করেছে বাজারে। এমনকি বেশি দামে জৈব ফসলও বিক্রি করেছে। এসব কিছুই খুব স্মার্ট পদ্ধতিতে করা হচ্ছে। এখানে যত সময় ধরে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, এই সময়ের মধ্যে পুঁজিবাদ কয়েকটা নতুন আবিষ্কার করে ফেলছে। সেগুলো ভালো না খারাপ সেটা বুঝতে আমাদের কয়েক বছর লেগে যাবে। আসল কথা হচ্ছে, ‘বাজার ব্যবস্থা’ সবসময়ই লাভ করতে চায়। এই ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝতে হবে। এটা যদি না বোঝা যায় তাহলে পুঁজি সবসময়ই সেটার লাভ নিজের কাছে নিয়ে যাবে। এটা এই সভ্যতার সংকট। এমন এক ধরনের আবহ সৃষ্টি করা হয় বা এমনভাবে প্রচার করা হয় যে, মনে হয় এটাই একমাত্র পথ। এটার বিরুদ্ধে বিকল্প আন্দোলন ও ক্যাম্পেইন দরকার। আর এই লড়াইটা সবাইকে করতে হবে। কে কৃষক বা কে ভোক্তা, এ ধরনের কোন ভেদাভেদ রাখা যাবে না। তবে ভোক্তাদের সচেতনতাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাসায়নিক ফসলের যদি কোন ভোক্তা না থাকে, তাহলে বাজারে রাসায়নিক ফসলের উৎপাদনও হবে না। তাই আমাদের বিকল্প বাজার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এজন্য ক্রান্তিকালীন বা স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করতে হবে। ক্রান্তিকালীন সময়ে বিকল্প বাজার ব্যবস্থা একটা পথ হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে পুরো বাজার ব্যবস্থাকেই পাল্টে ফেলতে হবে। যেই বাজারে কোন লাভের চিন্তা ছাড়াই পণ্য বিনিময় হতে পারে। এটা আমার এবং পৃথিবীর অনেক কৃষক আন্দোলনের বক্তব্য। যখন কৃষককে তাদের নিজস্ব চাহিদা বা মতামত প্রকাশের কথা বলা হয়, তার মানে আমরা সমাজে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চাই। যদিও আমরা সকলেই গণতান্ত্রিক সমাজে বাস করি, কিন্তু গণতন্ত্রকে কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তা আমরা সবাই বুঝতে পারছি না। এখন দেশে কোন পলিসি থাকবে বা থাকবে না, সেখানে পুঁজিবাদ সরাসরি হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু গণতন্ত্রের মূল শক্তি



বিনোদ কষ্টি

তো জনগণের হাতে। তাই পলিসি তৈরিতে জনগণের নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। এইরকম গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা (ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি) থাকতে হবে। এই বিষয়টা বোঝার জন্য ‘স্বাক্ষরতা’ একটা ভুল শব্দ, প্রকৃতপক্ষে ‘বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা’ অর্জন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আনু মুহাম্মদ, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দু’টি প্রধান কারণ হচ্ছে: ১) ভারতের বাঁধ নির্মাণের ফলে আমাদের নদীগুলো বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, এবং ২) আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নদীকেন্দ্রিক উন্নয়ন প্রকল্প।

এসব বাঁধের ফলে কিছু লোকের তৎক্ষণাৎ সুবিধাপ্রাপ্তি হয়। যেমন ঢাকা শহরকে বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে রক্ষা করা হল। কিন্তু যখন এই বাঁধের ভিতরে পানি জমছে তখন সেটা আর বের হতে পারছে না। পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছাড়া এ ধরনের প্রকল্প ক্ষতিকর। এ কারণে ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যান বাতিল করা হয়েছিল। এই যে নদীর বিরুদ্ধে স্ট্রাকচার্ড ওরিয়েন্টেড অ্যাপ্রোচ, এটা বড় বিপদের কারণ এবং সারা পৃথিবীতে এর সমালোচনা হচ্ছে। অনেকে বাঁধ ভেঙ্গে ফেলার চিন্তাও করছেন। নদী ভরাট করার ফলে ঐ অঞ্চলের কিছু মানুষের বা কিছু পরিবারের তাৎক্ষণিক কিছু লাভ হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত লাভ দিয়ে এগুলো বিবেচনা করা যাবে না। ঐটার বিকল্প আছে কিনা বা অন্য কিছু করলে অধিকাংশ মানুষের লাভ হত কিনা সেটা চিন্তা করতে হবে। কৃষকদের মধ্যেও অনেক ধরন রয়েছে। কৃষকরা মুনাফার জায়গায় যেতে চাচ্ছে- যেখানে মুনাফা হয় সেই কাজটা করতে চাচ্ছে, সেটা হল তার চূড়ান্ত পর্যায়। কৃষক কৃষি কাজ করে, কিন্তু তার বীজ, সার, কীটনাশক আসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। পরিবেশটাই এরকম করে গড়ে তোলা হয়েছে। এই মুনাফা ওরিয়েন্টেশন আসটাই স্বাভাবিক। এরকম ওরিয়েন্টেশন বা উন্মাদনা সৃষ্টি না করলে পুঁজিবাদ বাঁচতে পারবে না। ভোক্তাদের এবং উৎপাদকদের মাঝে এ ধরনের উন্মাদনা ছাড়া পুঁজিবাদ বাঁচতে পারবে না। বিভিন্ন ধরনের প্রচার, প্রচারণা এবং বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে পাগল বানানো হয় এবং বাজে ও ভেজাল জিনিস কিনতে উৎসাহিত করা হয়। কৃষক শ্রেণী তো আর সমাজের আলাদা কোন অংশ না। সুতরাং সেও এর দ্বারা প্রভাবিত হবে এটাই স্বাভাবিক।

সামাজিক প্রভাব এবং ব্যক্তিগত মুনাফা এর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, এটা একজন ব্যক্তির পক্ষে দেখা সম্ভব না। এটার জন্য দরকার পাল্টা জ্ঞান, মুভমেন্ট তৈরি করা। সম্মিলিত শক্তি তৈরি করা। সেটা ব্যক্তি থেকে আশা করা সম্ভব না। এসব দেখার দায়িত্ব সরকারের, কিন্তু সরকার সেই মুনাফা-নির্ভর ব্যক্তির পক্ষে। ঐ ব্যক্তির বিপক্ষে কেউ দাঁড়ালে সরকার পুলিশ পাঠিয়ে তাদের ধরে নিয়ে যায়, যাতে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে নদী দূষণ করতে পারে। এর বিরুদ্ধে যাতে মানুষের জ্ঞান তৈরি না হয় সেটার জন্য চলে বিজ্ঞাপনী প্রচারণা। পাল্টা জ্ঞান তৈরির জন্য প্রয়োজন জ্ঞানচর্চা। এছাড়া বিভিন্ন মুভমেন্ট ও জ্ঞানচর্চা এর মধ্যে সমন্বয় থাকা গুরুত্বপূর্ণ। সারা পৃথিবীতেই সংগ্রাম হচ্ছে। যে পথকে বলা হয়েছিল মানুষের উন্নয়নের পথ, কল্যাণের পথ, ক্ষুধা এবং দারিদ্র নির্মূলের পথ, সেই পথে চলতে চলতে পৃথিবী এখন বিপন্ন। পৃথিবীর অস্তিত্বই সংকটাপন্ন।

পাওলো সুইজি বলেছিলেন, যদি এই শতকে পুঁজিবাদ অব্যাহত থাকে তাহলে পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে না। পরিবেশ বিনাশ চক্রবর্তী হারে বাড়ছে। খুবই দ্রুত গতিতে হচ্ছে, বেশি মাত্রায় হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী যারা কর্তা তারা নিজেরাও এখন এ ব্যাপারে চিন্তিত। গোল্ডেন রাইস সম্পর্কে যে সকল তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে, সেটা কতটুকু গ্রহণযোগ্য এবং যেভাবে সাধারণ মানুষের কাছে

যাওয়ার কথা সেভাবে যাচ্ছে না। বিটি বেগুন সম্পর্কে বাংলাদেশের কৃষকরা নেতিবাচক সাড়া দিয়েছিল, কিন্তু তারপরও সেটা বন্ধ হয়নি। মন্ত্রণালয় এবং মনসান্টো এর মধ্যে যোগাযোগ এত নিবিড় যে, তারা কৃষক, সায়েন্টিফিক তত্ত্ব-প্রমাণ, কারো কথাই শোনে না। কারণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গেলে করপোরেটরা লাভবান হবে না। এসব সিদ্ধান্ত জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া হয় এবং প্রতিবাদ করতে গেলে ব্যবহার করা হয় ‘ল এনফোর্সমেন্ট’-কে। টিভিতে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, ডাক্তারের পোশাক পরে এসে বিভিন্ন পণ্য প্রমোট করতে। ডাক্তারের পোশাক পরলেও সে ডাক্তার না। সুতরাং পুরো ব্যাপারটার মধ্যে থাকে ধোকা, প্রতারণা এবং সততার অভাব। এজন্য আমাদের দরকার পাল্টা জ্ঞানের- যে চ্যালেঞ্জ করতে পারে এবং কাউন্টার ইনফরমেশন দিতে পারে। ভুল জ্ঞানের বিরুদ্ধে তথ্য ও জ্ঞানের অনুসন্ধান আমাদেরকে চালাতেই হবে।

সভাপ্রধানের বক্তব্য:

সুরাইয়া বেগম, রিইব

একজন কৃষকের সাথে কৃষির সম্পর্ক, জলবায়ুর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। কৃষক, কৃষি ও জলবায়ু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, একে অন্যকে ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। সেই সম্পর্কগুলোর মধ্যে যে সমস্যাসমূহ রয়েছে তার ব্যাপ্তি জলবায়ু, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজ, অর্থনীতি, লোকজ জ্ঞান প্রভৃতির সাথে যুক্ত। এগুলোর সাথে যুক্ত একজন কৃষকের আত্মসম্মানবোধ, তার অহংকার, তার সার্বভৌমত্ব। এই সব কিছুই সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু ফিল্ডে কাজ করতে গেলে দেখা যায়, কৃষকের মধ্যে জ্ঞান চর্চার সমস্যা অনেক প্রকট। কৃষককে নলেজেবল করা মানে অ-আ কিংবা এ-বি-সি-ডি শেখানো শিক্ষা না। এই শিক্ষা হল, সে তার নিজের সম্পর্কে কতটুকু জানছে, বা তার অবস্থান তার কাছে পরিষ্কার করা। কৃষকের টাকা কিভাবে কর্পোরেট সংস্থার পকেটে চলে যাচ্ছে এ ব্যাপারে সে অজ্ঞ। এজন্য অব্যাহত জ্ঞান চর্চায় কৃষকের থাকা খুবই জরুরী। এছাড়া আমাদের জ্ঞানভিত্তিক বিপরীত শক্তি তৈরি করতে হবে। কৃষি নিয়ে যারা কাজ করে তাদের নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে। জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি ভিত্তিক আন্দোলন বিভিন্ন লেভেল থেকে করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত জ্ঞান চর্চা কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। সকলকে ধন্যবাদ।



সুরাইয়া বেগম

দ্বিতীয় দিন: ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮

তৃতীয় সেশন:

বাংলাদেশের জলবায়ু ও কৃষি: ভবিষ্যৎ রূপরেখা ও করণীয়

এই অধিবেশনের সভাপ্রধান রিইব-এর উপপরিচালক সুরাইয়া বেগম সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন। এরপর কীনোট প্রবন্ধ উপস্থাপক সাইদুর রহমানকে গতকালের আলোচনা এবং গত ৩১ জুলাই ২০১৮ তারিখে সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে আয়োজিত ডায়ালগের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করতে অনুরোধ করা হয়। দুইটি ডায়ালগের সারসংক্ষেপ উপস্থাপনের পর মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে আহ্বান জানানো হয়।

পূর্বের ডায়ালগের সারসংক্ষেপ (জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশের কৃষি (সরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও গবেষকদের নিয়ে ডায়ালগ, ৩১ জুলাই ২০১৮)

- ❖ জলবায়ু পরিবর্তনের অনুঘটক/ সংযোগ গুলোকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুসন্ধান করতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বয় দরকার।
- ❖ কৃষি যেহেতু আমাদের জীবনের উৎস, কাজেই কৃষির সাথে জড়িত মানুষদের সম্মান থাকতে হবে। কৃষকরা যেন তাদের পেশাকে অপ্রত্যাশিত বা অভিশপ্ত মনে না করেন।
- ❖ প্রতিবেশগত কৃষির বিকল্প নেই। সেখানে সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার। জৈব কৃষির প্রদর্শনী খামার গড়ে তুলতে হবে।
- ❖ শিল্পের সম্প্রসারণের ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে। কারণ, এটি মাটি ও জলরাশিকে দূষিত করছে।
- ❖ কেবল খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে চলবে না, খাদ্যের মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- ❖ আমাদের খাদ্য তালিকায় কেবল দানা শস্য নয়, খাদ্যের বৈচিত্র্য দরকার।
- ❖ মাটির স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে। স্থানীয় উপাদান ও জ্ঞান ব্যবহার করে মাটির জৈব উপাদান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে।
- ❖ কেবল পশুসম্পদ ও মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধিতে নজর দিলে চলবে না। সেগুলো কী খাওয়ানো হচ্ছে, সেগুলো মানব স্বাস্থ্যের জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ কিনা, সেসব বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে।
- ❖ কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে কৃষি বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষাবিদ সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে।

জ্ঞানের সমন্বয়ের প্রয়োজন: মনোরঞ্জন মণ্ডল, পানি বিজ্ঞানী, আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা

জলবায়ু এবং কৃষির গণ্ডি অত্যন্ত ব্যাপক। এককভাবে তা প্রকাশ করা সম্ভব না। সমাজে যেমন চাহিদা আছে তেমনি সমস্যাও আছে। কোস্টাল এরিয়াতে যথাযথ উন্নয়ন হচ্ছে না, কারণ এখানকার কৃষি ষাটের দশকের। কোস্টাল হাইড্রোলজিটা একটু ভিন্ন ধরনের। অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানকার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নয়। এখানে পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্লুইস গেট আছে,



মনোরঞ্জন মণ্ডল

যেখান দিয়ে জোয়ার-ভাটার মাধ্যমে পানি ঢোকে এবং বের হয়। আমাদের মধ্যে জ্ঞানের সমন্বয়ের কিছুটা অভাব রয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন এবং সাথে সাথে সেটার সাফল্য-ব্যর্থতাও পর্যালোচনা করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে এবং এটা হবেই, এটা প্রাকৃতিক। বিভিন্ন নদী ভরাট হচ্ছে, এটাই স্বাভাবিক এবং নদী অনেক আগে থেকেই ভরাট হচ্ছে। ল্যাভরেটরি গবেষণা ও মাঠ পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ল্যাভরেটরিতে কিছু সফল হলে মাঠে সেটা সফল নাও হতে পারে। স্থানীয় জাত থেকেই

গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন রকম জাত বের করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থায় বিভিন্ন ডিসিপ্লিনার লোক থাকতে হবে এবং পর্যবেক্ষণ বাড়াতে হবে। আমাদের তথ্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে হবে।

কোম্পানির আশ্রাসন থেকে কৃষি ও কৃষকদের রক্ষা করা দরকার: এবিএম আনিসুজ্জামান, নাগরিক উদ্যোগ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষক, কৃষি এবং প্রতিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এটা সবাই অবগত এবং এ সম্পর্কিত যেসকল প্রকল্প নিয়ে কাজ করা হয় সেগুলো দুটো জিনিসের উপর ভিত্তি করে করা হয়: তা হল বাজার সিডিকেট এবং বহুজাতিক কোম্পানির প্রভাব। বাজার সিডিকেট ভাঙ্গার জন্য অনেক প্রকল্প সফলতার মুখ দেখে না। কারণ এর সাথে সরকারি দলের লোকেরা সংশ্লিষ্ট থাকে। তাই এসব সমস্যা মোকাবেলায় কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক শক্তি তৈরি এবং তার ব্যাপকতা বৃদ্ধি করতে হবে। কৃষক বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও চাষাবাদ করে ফসল উৎপাদন করে। কিন্তু সে ন্যায্য দাম পায় না। ফলে, তারা বরাবরই দরিদ্র থেকে যায়। মাঝখান থেকে লাভবান হচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগীরা। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর আশ্রাসনের ফলে তারা কৃষকদেরকে বীজ/সার সরবরাহ করছে। এতে করে তারা কৃষকদের অধিকার নিয়ন্ত্রণ করছে। এমনকি বহুজাতিক কোম্পানিগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকারকেও নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলো ঠিক করতে হবে আর জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম অর্থাৎ ইতিবাচক/নেতিবাচক বিষয়গুলো নিয়ে কর্ম পরিকল্পনা বাড়াতে হবে।



এবিএম আনিসুজ্জামান

প্রকৃতি ধ্বংস হয় এমন কৃষি থেকে ফিরতে হবে: উৎপল কান্তি খিসা, পিসিডিএফ



উৎপল কান্তি খিসা

বাংলাদেশে সমতলে কিংবা পাহাড়ে কোথাও কৃষকদের কৃষক সংগঠন নাই। হয়তো অনেকগুলো রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন আছে। কিন্তু সেখানে যারা প্রতিনিধিত্ব করছেন তারা প্রকৃত কৃষক না। এমনকি যারা কৃষক হিসেবে সরকার থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছে বা পাচ্ছে, তারা প্রকৃতপক্ষে মধ্যস্বত্বভোগী। ডানপন্থী এবং বামপন্থী রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, এক্ষেত্রে প্রায় একই ভূমিকা পালন করছে। প্রকৃত ক্ষুদ্র কিংবা প্রান্তিক কৃষক যথাযথভাবে সরকারি সুবিধা পায় না। বাংলাদেশের কৃষিনীতিতে জুম চাষকে কখনো ইতিবাচক হিসেবে নেয়া হয়নি বরং এটাকে ধ্বংসাত্মক পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে ব্রিটিশ আমল

থেকেই। দেখা যাচ্ছে যে, জুমচাষ বাদ দিয়ে সেখানে এমন কিছু যুক্ত করা হয়েছে যেটা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের লোকজ জ্ঞান দিয়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না, তারা ব্যর্থ হচ্ছেন, কারণ তাদের এই আধুনিক জ্ঞান ও টেকনোলজি নেই। আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে জুম চাষ পাহাড়ের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। এটা পরিবেশের ক্ষতি করেনা, উৎপাদন খরচ কম, সার/বিষ লাগে না। সুতরাং এ ব্যাপারেও সচেষ্টি হতে হবে, যাতে এ চাষ পদ্ধতি বিলীন না হয়ে যায়। তবে কৃষকদের শিক্ষিত করে তোলার পাশাপাশি জরুরী হল, কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট গবেষকদের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কৃষকদের সাথে আরো বেশি মাঠ পর্যায়ে সম্পৃক্ত হওয়া। একদিকে পাওয়ার প্লান্ট এর কথা বলে বন ধ্বংস করা হচ্ছে, অন্যদিকে কৃষিতে বাম্পার ফলনের কথা বলা হচ্ছে, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা নিশ্চিত হচ্ছে না। রাতকানা রোগ প্রতিরোধে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ধান খাওয়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। যথেষ্ট গবেষণা ও পরীক্ষা ছাড়া এসব জাত সরাসরি বাজারে নিয়ে আসা হলে ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যগত ও অন্যান্য ঝুঁকি দেখা দিতে পারে। রাসায়নিক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সবাইকে সতর্ক হতে হবে। কৃষকের উন্নয়নের জন্য কৃষকের ভয়েস সম্প্রসারিত করতে হবে। তাদের প্রতিনিধিত্ব, অংশীদারিত্ব এবং মালিকানাধীন নিশ্চিত করা না গেলে কৃষি সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়।

কৃষকদের অবহেলা করা যাবে না: মারুফা নুর শিফা, নাগরিক উদ্যোগ

কৃষিকে আমরা বলি জীবন। কিন্তু কৃষিই সবচেয়ে অবহেলার শিকার। কৃষকের মর্যাদা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গার্মেন্টস শ্রমিক আন্দোলনকে খুব হাইলাইট করা হলেও কৃষির ব্যাপারগুলো সেভাবে হাইলাইট হয় না। কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শ্রমিক ও নারী কৃষকের মর্যাদা বৃদ্ধিতে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া দরকার। তথ্যবিভ্রাট থেকে মুক্ত হয়ে কৃষকদের সঠিক তথ্য প্রদান করতে হবে। এজন্য আন্দোলন ও সংগঠনের বিকল্প নেই। কৃষকদের সাংগঠনিক



মারুফা নুর শিফা

ব্যাপারকে গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। কৃষির সাফল্যগুলোও বিভিন্ন মহলে প্রচার ও সম্প্রসারণ করতে হবে। তাহলেই জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট কৃষি সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভবপর হবে।

কৃষি-প্রতিবেশ রক্ষা করতে হবে: মিজানুর রহমান, নিজেরা করি

আমাদের প্রাচীন একটি ঐতিহ্য হল, গোয়াল ভরা গরু, গোলা ভরা ধান। আমাদের দেশে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরাসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়। কিন্তু কৃষক কারো আশায় বসে থাকে না। সারভাইভ করে তারা আবার কৃষিতে ফিরে যায়। যথাযথ কৃষি এবং কৃষি জমি ব্যবহারের নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং সেখানে সংশ্লিষ্ট সবার ভূমিকা



মিজানুর রহমান

থাকা জরুরী। জমি ব্যবহারের ক্ষেত্র কৃষির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে হাইকোর্টের নির্দেশনাও মানা হচ্ছে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজেরা করি কৃষকদের ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কাজ করে থাকে। এর অংশ হিসেবে কৃষকরা খুলনার একটি অঞ্চলে ৩০ লক্ষ টাকার তরমুজ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। কৃষকরা এমনিতেই অনেক জ্ঞানী। বলা হয়ে থাকে সকল জ্ঞানের উৎস হল লাঙ্গল। তাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত করার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে হবে।

স্থানীয় জ্ঞান ও শক্তি বৃদ্ধিতে কাজ করতে হবে: দেলোয়ার জাহান, প্রাকৃতিক কৃষি

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে জলবায়ু-নির্ভর কৃষিকাজ করে এরকম কৃষকের জ্ঞান বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গত ৩০-৪০ বছর ধরে কৃষককে নিজের জ্ঞান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। এ ব্যাপারে তিনটি ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রথমত, গত ৩০-৪০ বছর ধরে কৃষকদেরকে রাসায়নিক কৃষির যে মগজ ধোলাই দেয়া হয়েছে তার বিপরীতে এ্যান্টি মগজ ধোলাই দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, বিকল্প উৎপাদন ব্যবস্থা ও বিকল্প কৃষি বিষয়ক জ্ঞান সঠিকভাবে কৃষককে দিতে হবে। তৃতীয়ত, কৃষকের উৎপাদিত ফসলের সঠিক বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করতে হয়, যাতে তার মুনাফা নিশ্চিত হয়। কৃষির বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করে দেখা যায় সব জায়গাতেই এই তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ের অভাব আছে। এগুলোর সঠিক পরিচর্যা হলে আশা করা যায় কৃষি, কৃষক এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষিতে সৃষ্ট সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভবপর হবে।



দেলোয়ার জাহান

প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও মাটির দিকে নজর দিতে হবে: ড. উম্মে আমিনুর নাহার, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে কৃষি বিজ্ঞানীরা অনবরত গবেষণা করে যাচ্ছে। বিভিন্ন জাতের আবিষ্কার ছাড়াও বন্যাসহিষ্ণু, খরাসহিষ্ণু কিংবা বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্যাগুলো হচ্ছে, সেই প্রবলেম ওরিয়েন্টেড জাত নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। ক্রপিং প্যাটার্ন নিয়েও কাজ করা হচ্ছে, যেমন: যেখানে স্বল্পমেয়াদী ধান চাষ করা হয়, সেখানে সরিষাকে ঐ ক্রপিং প্যাটার্নের মধ্যে নিয়ে আসলে কার্বন নিঃসরণ কম হবে। আমাদের দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও পুষ্টিতে হয়নি, সেজন্যেও কাজ করা হচ্ছে। জমি খালি রাখা



ড. উম্মে আমিনুর নাহার

যাবে না। জমিতে অনবরত আবাদ করলে বাতাস থেকে কার্বন শোষিত হবে এবং বাতাসে কার্বনের মাত্রা ধরে রাখা যাবে। এতদিন রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়েছে, কিন্তু গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসায়নিক সারের ব্যবহারের ফলে মাটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেসকল জমিতে ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হচ্ছে, সেখানে উপকারী ব্যাকটেরিয়া কমে গিয়েছে। কিন্তু যেখানে জৈব সার ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে এই ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি বজায় আছে। জৈব সার তৈরির ক্ষেত্রে গোবর সংকট রয়েছে। সেক্ষেত্রে অন্যান্য বর্জ্য যেমন, রান্নাঘরের বর্জ্য যদি রিসাইকেল করা হয় তাহলে এগুলোও জৈবসারের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এজন্য প্রয়োজন সরকারের সুদৃষ্টি। জৈব সার উৎপাদন এবং পরিমাণে বেশি লাগে বলে রাসায়নিক সারের চেয়ে তুলনামূলক খরচ বেশি হয়। সেক্ষেত্রে যারা উদ্যোগ নিচ্ছেন তারা পিছিয়ে পড়ছেন। সুতরাং সরকার যেভাবে রাসায়নিক সারে ভর্তুকি দিচ্ছে, সেভাবে জৈবসারের ক্ষেত্রে উৎপাদক বা উদ্যোক্তাকে ভর্তুকি দিলে জৈবসারের প্রক্রিয়াজাত সহজ হবে। সুতরাং জৈব কৃষি নিশ্চিত করতে রাসায়নিক সারের বদলে জৈব সার ব্যবহারের প্রচলন করতে হবে। এছাড়া সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন এবং তার প্রয়োগের ব্যাপারেও মনোযোগ দিতে হবে। মান উন্নয়নের মাধ্যমে অর্গানিক প্রডাক্ট দেশের বাইরে রপ্তানি করা সম্ভব।

প্রাকৃতিক কৃষির প্রসারে সমন্বয় দরকার: সীমা দাশ শিমু, উবিনিগ

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানবসৃষ্ট সমস্যাগুলোর ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। যেমন, অপরিবর্তিত রাস্তা-ঘাট, বাঁধ, সেতু প্রভৃতির কারণে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। এগুলো কৃষির ক্ষেত্রে বড় বাধা। স্থানীয় বন্যা, খরা, লবণসহিষ্ণু ধান জাত চিহ্নিত করে কৃষকদেরকে দিতে হবে। নীতি-নির্ধারক পর্যায় থেকে কৃষক ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে ডায়ালগ বা যোগাযোগ স্থাপন করলে সেটা খুবই ভাল উদ্যোগ হবে। জিএমও'র ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ এর ক্ষতিকারক দিকই বেশি। প্রাকৃতিক কৃষির সাথে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠনের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। একটি সুনির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এটা করা গেলে সবচেয়ে কার্যকর হবে। কর্পোরেট কৃষিতে পৃষ্ঠপোষকতা না করে, প্রাণ ও পরিবেশ বান্ধব কৃষিতে, অর্থাৎ জমির সার্বিক উৎপাদনশীলতা বাড়ায় এমন কৃষির ব্যাপারে পরিকল্পনা করতে হবে।



সীমা দাশ শিমু

ইতিবাচক সাংস্কৃতিক ও কৃষক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে: তানভীর শাতিল, গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক

জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন নেতিবাচক দিক রয়েছে। এর পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সমস্যা মোকাবেলায় উবিনিগের 'নয়া কৃষি', 'প্রাকৃতিক কৃষি'র মত বিভিন্ন আন্দোলন প্রয়োজন। তবে কৃষকের ভয়েস সামনে নিয়ে আসার জন্য কৃষক সংগঠনের বিকল্প নেই। কৃষক সংগঠন কিভাবে করতে হবে বা কিভাবে করলে কার্যকরী হবে, সেটা নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে। কৃষি সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়েছে এবং কৃষককে যদি আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিতে হয় তাহলে

মনোজাগতিক পরিবর্তন দরকার। সেক্ষেত্রে কৃষকের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তন বা আন্দোলনের অবকাঠামো তৈরির জন্যও কৃষক সংগঠনের বিকল্প নেই। কৃষকের সাথে ভাষাগত সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে। এমন ভাষা ব্যবহার করতে হবে যা কৃষকের জন্য সহজে বোধগম্য এবং সুবিধাজনক হয়। এছাড়া জৈব সার তৈরিতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা হলে ভাল হয়, কিন্তু সব সময় সরকারের উপর নির্ভরশীল না থেকে এর বিভিন্ন জ্ঞান, চর্চা ও দক্ষতা কৃষকের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার, যাতে কৃষক নিজেরাই স্বাবলম্বী হতে পারে। গবাদিপশু পালনে যথার্থ উদ্যোগ নিতে হবে এবং গবাদিপশুজাত বিভিন্ন উপকরণ কৃষিতে ব্যবহারের কার্যকর পরিকল্পনা নিতে হবে।



তানভীর শাতিল

বৃহৎ প্রকল্পের পাশাপাশি কৃষকদের ভয়েস শুনতে হবে: ড. অনিল দাস, কান্ট্রি ডিরেক্টর, এফএও, ঢাকা

বাংলাদেশের জাতীয় কৃষি নীতি সম্প্রতি আপডেট করা হয়েছে। এগ্রিকালচার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি, এগ্রিকালচার এক্সটেনশন পলিসি, ইত্যাদি করা হয়েছে। সম্প্রতি গবাদিপশু খাতে ৫০০ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, যার ফলে দেশের গবাদি পশুর চেহারাই পাল্টে যাবে। কৃষির বিভিন্ন বড় বড় সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয়গুলোতে নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত শোনা দরকার। নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে কৃষকরা যাতে কথা বলার সুযোগ পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।



ড. অনিল দাস

মাটি, প্রকৃতি ও ঐতিহ্যবাহী কৃষি উপকরণ সংরক্ষণে প্রণোদনা দরকার: দেওয়ান আক্তারুজ্জামান, ফেয়ার

কৃষকের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যাচ্ছে যে, কৃষকরা কৃষি কাজের সাথে যুক্ত থাকতে চাচ্ছে না। কৃষক তার উৎপাদিত ফসলের সুফল ভোগ করতে পারছে না, একটা চক্রের মধ্যে আটকে যাচ্ছে। এতে তারা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একদিকে অধিকাংশ কৃষক যা উৎপাদন করছে তা নিরাপদ না, আবার অন্যদিকে যারা নিরাপদ খাবার উৎপাদন করছে তারা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। অর্গানিক খাবারের দাম তুলনামূলকভাবে বেশি। তাই এর আরও চাহিদা তৈরি করতে হবে। চাহিদা তৈরির জন্য সর্বসাধারণের মধ্যে নিরাপদ খাবার

সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। যেমন প্রচার করতে হবে যে, সাদা আটার চেয়ে লাল আটা অনেক বেশি উপকারী এবং স্বাস্থ্যকর। নিরাপদ খাদ্য আন্দোলন গড়ে তোলা খুবই জরুরী। এছাড়া কৃষকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষিবীমা চালু করা দরকার। বয়স হলে কৃষক বেকার হয়ে যায় এবং অনিশ্চিত জীবন যাপন করে, তাই কৃষকের পেনশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। পাট চাষের ফলে পাট থেকে জৈবসার তৈরি করা যায় এবং বর্তমানে পাটের পাতা থেকে চা উৎপাদন করা হচ্ছে, যা স্বাস্থ্যকর ও পরিবেশ বান্ধব। পলিথিনের বিকল্প হিসেবেও পাটের



দেলোয়ার জাহান

ব্যবহার আরও বাড়তে হবে। পাট জাতীয় সম্পদ। কৃষকদের পাট চাষের ব্যাপারে যথাযথ উৎসাহ, জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সবকিছু মিলিয়ে সঠিক পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিলে কৃষি, কৃষক এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।

নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে প্রকৃতি ও পরিবেশের গুরুত্ব বাড়তে হবে: বাবুল আকন, আইআইডি
দিনশেষে সবকিছুই পলিসিকেন্দ্রিক। তাই পলিসি-মেকিং খুব গুরুত্বপূর্ণ। সংশ্লিষ্ট পলিসি না থাকার ফলে বিদ্যমান সমস্যার সমাধানে অনেক কিছুই করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে, কৃষক ‘পলিসি’ বোঝে কিনা সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং পলিসি হতে হবে সহজ, সরল ও বোধগম্য। এখানে এথ্রো-ইকোলজি, নাকি আধুনিক কৃষি, কোনদিকে যাওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এক্ষেত্রে লাভজনক এথ্রো-ইকোলজিই সবচেয়ে কার্যকর হবে, কারণ দিন শেষে কৃষকও বাণিজ্যিক চক্রের অংশ। আমার মনে হয়, লোকজ জ্ঞান না বলে ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান বলা উচিত। আর এর সাথে একুশ শতকের জ্ঞান যুক্ত করে কিভাবে লাভজনক এথ্রো-ইকোলজিতে যাওয়া যায় সেটাই মূল বিষয় হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে এ সংক্রান্ত জ্ঞান পলিসি-মেকারদের কাছেও নিতে হবে, আবার কৃষকের কাছেও নিতে হবে। মাঠ পর্যায়ে কৃষকের সাথে কথা বলে সেটা গবেষকদের মাধ্যমে পলিসি-মেকারদের কাছে যেতে পারে। পলিসি-মেকারদেরও বোঝাতে হবে কোনটা আমাদের জন্য ভাল বা খারাপ। কোনটা নেওয়া উচিত, কোনটা



বাবুল আকন

নেওয়া উচিত নয়। তাদের জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সামগ্রিকভাবে কৃষি ও কৃষকের উপযোগী, পরিবেশ-বান্ধব ও লাভজনক পলিসি নিয়ে কাজ করতে হবে। আবার বর্তমান কৃষকরা বৃদ্ধ হয়ে গেলে, তরুণরা তাদের জায়গা দখল করবে, তাই কৃষির সাথে তরুণদের সম্পৃক্ততা ব্যাপকভাবে বাড়তে হবে। অর্থাৎ তৃণমূল থেকে পলিসি-মেকার পর্যন্ত সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে কৃষক, গবেষক, বিজ্ঞানী, পলিসি-মেকারদের মাঝে সমন্বয় করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় একটি কার্যকর পলিসি নিয়ে সবাইকে ভাবতে হবে।

কৃষকের মুনাফার দিকে নজর দিতে হবে:
নিশাত হামিদ, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ
গবেষক

কৃষকদের যদি বলা হয় যে জৈব কৃষি করলে পরিবেশের জন্য ভাল বা স্বাস্থ্যের জন্য ভাল হবে, তারা কিন্তু শুনবে না বা করবে না, যদি না সেখানে মুনাফা বা লাভ থাকে। প্রাইভেট সেক্টরকে এজন্য এগিয়ে আসতে হবে এবং সেই সাথে সবার মানসিকতার পরিবর্তনও জরুরী। অর্থাৎ পরিবেশের দিকটাও খেয়াল রাখতে হবে, আবার লাভ নিয়েও চিন্তা করতে হবে। কৃষকরা এখন অনেক বেশি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, তাই এখন লাভজনক কৃষি ছাড়া, কৃষিকাজ করবে না।



নিশাত হামিদ

প্রাকৃতিক কৃষির প্রসারে সরকারের পাশপাশি ভোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে: দারুল ইসলাম,
উন্নয়ন ধারা

প্রাকৃতিক কৃষির সাথে যুক্ত যারা তাদের যেমন দায়িত্ব আছে, সরকারেরও তেমন দায়িত্ব আছে। কৃষিখাতে সরকারি বাজেটের টাকা অনেক সময় অব্যবহৃত থেকে যায়, সেখান থেকেও জৈব সার তৈরিতে ভর্তুকি দেওয়া যায়। এতে জৈব কৃষি তথা কৃষকের উন্নয়নে ভূমিকা রাখা যাবে। এছাড়া কৃষকদের সংগঠিত করাও খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কৃষিতে একার পক্ষে কোন কিছুই করা সম্ভব নয়। উন্নয়ন ধারা ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সংগঠন তৈরির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এখানে কৃষকদের সাথে আলোচনা ও মত বিনিময় সভা করা হয়। তবে কৃষকরা নিরাপদ কৃষিতে আসলেও তাদের কোন বাজার নেই। তাই বিকল্প বাজার তৈরি করতে হবে। এই ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়



দারুল ইসলাম

হচ্ছে, নদীর স্বাভাবিক গতি ফিরিয়ে আনতে হবে। তাহলে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষির যে সমস্যা হচ্ছে, তা অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা যাবে। দেশীয় বীজ সংরক্ষণ করতে হবে এবং ছড়িয়ে দিতে হবে। এছাড়া ভোক্তাদের সচেতন করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে কোন ফসলটা ক্ষতিকর, আর কোনটা উপকারী। কোনটা পরিবেশের জন্য ভাল, কোনটা খারাপ। আর ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রতিবেশ-ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও ক্ষতিকর কৃষির ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বাড়ছে:
মো: ইফতেখার আলী, রিইব

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সাথে কৃষিকে টিকিয়ে রাখতে হলে, খামারের ‘ইকোলজিক্যাল রেজিলিয়্যান্স’ (প্রতিবেশগত স্থিতিস্থাপকতা) ও কমিউনিটির যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সুস্থায়ী

চাষের দিকে যেতে হবে। খামারে স্থানীয় প্রজাতির শস্য ও অশস্যের বিভিন্ন জাতের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করলে, বিভিন্ন রকম প্রাণী আসে। ফলে সেখানকার উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীবের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং খামারের ইকোসিস্টেমের চক্র দৃঢ় হয়। এর মাধ্যমে ঐ খামারে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বালাই তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতি করতে পারে, বা আক্রান্ত হলেও দ্রুত আগের অবস্থায় ফিরে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, একই শস্যের নানান জাত একসাথে চাষ করলে বা একই সাথে নানান প্রজাতির শস্য চাষ করলে এবং প্রাকৃতিক বালাই-ব্যবস্থাপনা ব্যবহার



মো: ইফতেখার আলী

করলে, বালাই এর উপদ্রব কম হয় এবং সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। শস্যের জাত নির্বাচনের ক্ষেত্রে খামারের মাটি, পানি, আবহাওয়া ও স্থানীয় সংস্কৃতি বিবেচনায় রাখতে হবে। যেসব পরীক্ষিত জাতের ঘাতসহতা বেশি ও উৎপাদনের হারের সমতা বজায় থাকে, সেগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। আর কল-কারখানায় প্রস্তুতকৃত কৃত্রিম কৃষি উপকরণ ব্যবহার করলে, সেগুলো তৈরি করতে একদিকে যেমন জলবায়ু পরিবর্তন ত্বরান্বিত হবে, অন্যদিকে সেগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে খামারের জীববৈচিত্র্য নষ্ট হবে ও পরিবেশ দূষিত হবে। জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে গেলে খামারের ‘ইকোলজিক্যাল রেজিলিয়্যান্স’ নষ্ট হয়ে যাবে এবং যে কোন বালাই খুব সহজেই খামারের ফসলহানি করবে। এছাড়া আমাদের নিজেদের মধ্যে ‘কমিউনিটি’র চেতনা জাগ্রত করতে হবে, যাতে বীজ বিনিময়সহ বিভিন্ন বিষয়ে কৃষক পরস্পরের উপর নির্ভর করতে পারে এবং প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর যাতে সুস্থায়ী ব্যবহার করা যায়। সম্প্রতি আমেরিকার আদালত মনস্যান্টো কোম্পানির আগাছানাশকের সাথে মানুষের ক্যান্সারের সম্পর্কের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ঐ কোম্পানিকে কয়েক কোটি টাকা জরিমানা করেছে। ভারতের অন্ধপ্রদেশে বিটি তুলার চাষ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কিউবাতে নব্বই এর দশকে সিনথেটিক সার ও কীটনাশক বিষের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। এতে সাময়িক খাদ্য সংকট দেখা গেলেও কয়েক বছরের মধ্যে জৈব কৃষির মাধ্যমে তারা আগের মতই খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম হয়। বিভিন্ন দেশের এই ঘটনাগুলো থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে এবং এ সংক্রান্ত পলিসি নিতে হবে। এছাড়া এখন বিভিন্ন সরকারি পলিসি চূড়ান্ত করার আগে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ওয়েবসাইটে মন্তব্য প্রদানের জন্য রাখা হয়। আমাদের সকলের উচিত সেসব জায়গায় মতামত দেওয়া এবং সুস্থায়ী কৃষি নীতি গ্রহণে কাজ করা।

কৃষকদের কাছে বাজার যাচ্ছে, কিন্তু তার কাছে অধিকারের কথা কমই বলা হচ্ছে: ড. নীলুফার হাই করিম, রিইব

কৃষকের অধিকার নিশ্চিত করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেটা এদেশে এখনও সম্ভব হয়নি। কৃষকদের কাছে গিয়ে কি কি করতে হবে তা বলা হচ্ছে, কিন্তু তার যে বিভিন্ন অধিকার আছে, সেটা বলা হচ্ছে না। আর কৃষকদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কৃষক সংগঠন জরুরী। তা না হলে তারা শক্তিশালী হতে পারবে না। এজন্য এ ব্যাপারে কাজ করে যেতে হবে।



ড. নীলুফার হাই করিম

নির্ধারিত আলোচকদের বক্তব্য:

একসাথে কাজ করতে হবে: বিনোদ কষ্টি, রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং, নিউ দিল্লী

ভারতে সম্প্রতি প্রায় ১৩০টির বেশি সংগঠন একসাথে একটি কমন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে, যেটা ক্রমাগতভাবে কৃষকের দাবি আদায়ে আন্দোলন করে যাচ্ছে। এই প্ল্যাটফর্মের ওয়েবসাইটও আছে, যেখানে সংগঠনগুলো নিজেদের কাজের খবর ও ছবি শেয়ার করে, ফলে মুহূর্তের মধ্যে সকলে সব কিছু জেনে যাচ্ছে। অর্থাৎ চাইলেই একসাথে কাজ করা সম্ভব। এছাড়া এক ধরনের সায়েন্টিফিক টেম্পারমেন্ট তৈরি করতে হবে যে, কোন তথ্য বা প্রযুক্তি আমরা সরাসরি গ্রহণ করব না; পরীক্ষা করে তারপর সেটা গৃহীত হবে। বিজ্ঞানী ও কৃষকদের মধ্যে গ্যাপ কমাতে হবে এবং তাদের মধ্যে যোগাযোগ আরও বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে।



বিনোদ কষ্টি

কৃষিতে তথাকথিত আধুনিকতার নেতিবাচক প্রভাব ও প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয়: ড. লতিফুল বারি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মনুষ্যসৃষ্ট বিষয়গুলোই বেশি দায়ী। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হলেও আমাদেরকে বোতলজাত পানি কিনে খেতে হয়। কিছুদিন পর পানির জন্য যুদ্ধ করতে হবে। সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, তারা টাকা চান না পানি চান। ঢাকাতে যদি তিনদিন পানি বন্ধ রাখা হয় কী দুরবস্থা হবে তা অকল্পনীয়। ভূ-পৃষ্ঠের পানি ভূ-গর্ভের পানির চেয়ে অনেক ভাল, এতে আর্সেনিক থাকে না। ভূ-গর্ভস্থ পানির জন্য এখন আমাদের ৮৫০ ফুট নীচে যেতে হচ্ছে, সামনে দেখা যাবে ১৮৫০ ফুট যেতে হবে। সুতরাং ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব



ড. লতিফুল বারি

দিতে হবে। বিভিন্ন গবেষণা বলছে যে, সাগরের পানিকেও ব্যবহার করা যায়। এখন ১০-১৫ টাকা করে পানি পাওয়া গেলেও ভবিষ্যতে ১০০ টাকা হয়ে যাবে। এটা হবেই, কারণ জনসংখ্যা বাড়ছে দ্রুত এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবস্থাপনা ঠিকমত করা হচ্ছে না।

কৃষকরা ঠিকমত সুবিধাদি পাচ্ছে না, তাদের সামাজিকভাবে হেয় করা হচ্ছে। তারা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। এগুলো সবই মানুষের সৃষ্টি, কারণ কৃষকরা রাজনৈতিক দলের নেতার কাছে বন্দী। সরকার ভর্তুকি দিচ্ছে প্রতি বছরই, কিন্তু সেটা যাচ্ছে তার রাজনৈতিক দলের নেতার কাছে। কৃষক

সংগঠন না থাকা একটা বড় কারণ। কিন্তু সংগঠন থাকলেও তারা পেত কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে, কারণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্র্যাকটিসটাই এরকম। তখন দেখা যাবে সংগঠনের নেতারা পাবে কিন্তু প্রকৃত কৃষকরা পাচ্ছে না। এ বাস্তবতায় আমাদের কী করা উচিত?

অবশ্যই প্রথমে তাদের সহযোগিতা করা উচিত। একটা সংগঠন লক্ষ টাকার চাষ নামে একটা পদ্ধতি করছে, এতে যদি কোন কৃষকের ১৫০ শতাংশ থাকে, তাহলে সেটাকে ৫ ভাগে ভাগ করা হয়। তারপর নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদনের জন্য যা যা দরকার কৃষককে তা সরবরাহ করছে, কৃষক উৎপাদিত ফসল তাদের কাছে বিক্রি করছে এবং সেই সংগঠন সেটা বাজারজাত করছে। এ ধরনের ছোট ছোট উদ্যোগ হতে পারে। কারণ কৃষকদের শেখানো একটা বড় কাজ। অন্যদিকে কৃষকরা তাদের সমস্যা অনেক ভাবে বুঝতে পারেন। বিজ্ঞান শিখতে হলে তাদের কাছে যেতে হবে, কারণ তারা অনেক অভিজ্ঞ।

রাসায়নিক সার ব্যবহারের কারণে মাটির জৈব উপাদানের পরিমাণ একদম কমে গেছে, এখন ০.২- সর্বোচ্চ ২%। অথচ এটা ৫% হলে খুবই ভাল হত। বলা হয় সুস্থ মাটি সুস্থ গাছের জন্ম দেয়। মাটি যদি সুস্থ থাকে সারের পরিমাণও কম লাগবে। এখন কমে গেলেও, আমাদের মাটিতে কিছু নির্দিষ্ট অনুজীব ও প্রাণী (অর্গানিজম) আছে, যেগুলো নির্দিষ্ট কিছু গাছ ও সামগ্রিকভাবে সুস্থ মাটির জন্য উপকারী। এই অনুজীবগুলো বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে, তাহলেই অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। একটা বিষয় খুব খেয়াল রাখতে হবে যে, অন্য এলাকার বা বিদেশের কোন অনুজীব বা প্রাণী আনা যাবে না। যেমন সিলেটের একটা অনুজীব পাবনার মাটিতে দেওয়া যাবে না। কারণ সেটা পাবনার মাটির অন্যান্য অনুজীবের সাথে প্রতিযোগিতা করে বেঁচে থাকতে পারবে কিনা, বা পাবনার মাটির অনুজীবগুলোকে মেরে ফেলবে কিনা সেটার কোন নিশ্চয়তা নেই। অনুজীবগুলোও যেখানে আছে, সেখানেই সে স্ট্যাবল। অর্থাৎ কোন এলাকার অনুজীব অন্য এলাকায় দেওয়া যাবে না, ঐ এলাকাতেই ব্যবহার করতে হবে।

আমি কৃষকদের এরকম মাইক্রোবিয়াল এন্টিভেটর (জীবাণু সার) দিয়ে থাকি। এরকম এক কেজি সার প্রায় ১০০ কেজি জৈব সারের সাথে বিকালে মিশিয়ে রেখে দিয়ে সকালে জমিতে ব্যবহার করতে বলি। কিন্তু ব্যবসায়ীরা এতে বাধা দেয়, তারা এটা কৃষকদের কাছে বিক্রি করতে

চায়। এখন পর্যন্ত ৩২টি জেলাতে এরকম কৃষকদের কাছে দেওয়া হয়েছে। এটার কোন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নেই, এটা সবাইকে বোঝাতে হচ্ছে। এভাবেই সব ব্যাপারে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

আমাদের দেশে কেঁচোর অনেক জাত থাকার পরও, বিদেশ থেকে কেঁচো আনা হয়েছে, যেটা পুরোপুরি নিষিদ্ধ। জৈব নীতিমালাতে বলা আছে, বাইরে থেকে কোন বায়োলজিক্যাল সাবস্টেন্স আনা যাবে না, কারণ এতে স্থানীয় জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এরা শিকারী হয়ে অন্যান্য জীব মেরে ফেলতে পারে। গবেষণা করে এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশের নীতি-নির্ধারকরা অনেক সময় চাপে পড়ে এসব সিদ্ধান্ত নেন। একেয়াকালচারের ক্ষেত্রেও লাইভ ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়, সেটাও ঠিক নয়। সুতরাং এসব বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন নীতিমালা নেই। যার সুবাদে বিদেশী কোম্পানিরা আসে এবং ব্যবসা করতে পারে। দেশের মানুষ এসব ব্যাপারে যত কম জানবেন ব্যবসা করতে তত সুবিধা।

যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তনের অধিকাংশ কারণ মানুষের সৃষ্টি, তাই মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করাটা খুবই জরুরী। আগে দেশে প্রত্যেক গ্রামে একটা করে সংরক্ষিত পুকুর থাকত, সাধারণত গ্রামের মাতবর বা চেয়ারম্যানের বাড়িতে। গ্রামে যখন পানি সংকট দেখা দিত, তখন সকলে ঐ পুকুরের পানি ব্যবহার করত। আগে গ্রামের মানুষ তাদের পছন্দের কাউকে জোর করে চেয়ারম্যান বানাতেন। আর এখন প্রায়শই দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে বদমাইশ লোকটা হয় চেয়ারম্যান। ঐরকম সংরক্ষিত জলাধার এখনও খুবই দরকার। আমাদের পূর্বপুরুষরা যথেষ্ট জ্ঞানী ছিলেন। এরপর যারা আসলেন তারা খুব একটা জ্ঞানী ছিলেন না, তারা সুবিধাবাদী। যার কারণে আজকের এইসব সমস্যা। মানুষই সব সমস্যার সৃষ্টি করেছে, অন্য সবকিছু ঠিকই আছে। তাই হাইজিন, স্যানিটেশনসহ সব বিষয়ে জানতে হবে ও সচেতন হতে হবে, তাহলেই অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

খাদ্যের মানের দিকে না তাকালে সংকট তৈরি হবে: ড. মোহাম্মদ নাজিম উদ্দীন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট- বারি

বর্তমানে যে খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা, সেখানে ১৯৪২-৪৩ সালের দিকে সিনথেটিক নাইট্রোজেন বা ইউরিয়া সারের ব্যবহার শুরু হয়। অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ খাবার খেলে কি হয়, তা নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ঐ গবেষণায় দেখা যায় যে, অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ খাবার যখন মুখে যায় বা এরপর পাকস্থলীতে যায় তখন এটি শরীরের উপকারী ব্যাকটেরিয়াগুলোর ক্ষতি করে। এছাড়া আমাদের বর্তমান খাদ্যাভ্যাসের ফলে যে প্রচুর ফাস্ট খাদ্য বা জাঙ্ক খাদ্য খাওয়া হয়, তার ফলে নিউরাল সমস্যার



ড. মোহাম্মদ নাজিম উদ্দীন

সৃষ্টি হয়। একদিনের খাবারে হয়ত এটা বুঝা যায় না, কিন্তু দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি দেখা যায়। এখন উচ্চবিত্তের সন্তানেরা বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছে। এসব সমস্যার সাথে খাদ্যাভ্যাস সরাসরি জড়িত। আমরা খাবার খাই প্রধানত পুষ্টির জন্য, এরপর আনন্দের জন্যও। এখন পরিমাণগতভাবে আমরা অনেক খাদ্য উৎপাদন করছি, কিন্তু পুষ্টি অর্ধেক পাচ্ছি। খাদ্য উৎপাদনে যে জাতগুলো চাষ করছি সেগুলো পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ না। এছাড়া খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের পদ্ধতিগুলোও স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

জলবায়ু পরিবর্তন আমরা বন্ধ করতে পারব না, কিন্তু সেটাকে কতটা সহনীয় পর্যায়ে রাখা যায় সেটা নিয়ে কাজ করতে হবে। সাধারণত মাটিতে ৫% জৈব উপাদান থাকে। ১৯৬০ এর দশকে এটা ছিল গড়ে ৩.৫%। আমরা যদি ১৩,০০০ বছরের কৃষির ইতিহাস দেখি, তাহলে দেখা যায় ১২,৯৪০ বছরে জৈব উপাদান কমেছে ১.৫%। অথচ রাসায়নিক কৃষি শুরু হওয়ার পর গত ৬০ বছরে তা কমে গেছে প্রায় ২.৫%। আমরা খুবই দ্রুত মাটি নষ্ট করে ফেলছি। অথচ বেঁচে থাকার প্রথম শর্ত হল খাবার, আর খাবার উৎপাদন করতে হলে প্রথমে মাটি বাঁচাতে হবে। মাটি বাঁচাতে হলে তার স্বাস্থ্য ও উর্বরতা বা জৈব উপাদান ঠিক রাখতে হবে।

অন্যদিকে আমরা খাদ্য উৎপাদনে সফল হয়েছি, কিন্তু খাদ্যের গুণগত মানও অনেক বড় ইস্যু। বিআর-২৯ ধান একটি ব্যাপক জনপ্রিয় জাত। কিন্তু এই ধানের চালে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (জিআই) খুব বেশি, অর্থাৎ খেলে ডায়াবেটিস বেড়ে যাবে। পরিস্থিতি অনুযায়ী যখন খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর দরকার ছিল, তখন হয়ত এসব জাত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এসব জাতের ক্ষতিকর প্রভাব ধরা পড়ার পর, সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া দরকার।

জৈব কৃষি শুধু নির্দিষ্ট কোন ফসলের চাষ নয়, এটা একটা সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থাপনা। অস্ট্রেলিয়া বা আমেরিকার কৃষির সাথে আমাদের কৃষিকে মেলালে চলবে না। সেখানে কৃষক সম্মানিত মানুষ, আমাদের দেশে সেটা না। কৃষকরা সারা বছর পরিশ্রম করে উৎপাদন করলেও সবক্ষেত্রেই সে ঠেকে। আমাদের দেশে শক্তিশালী কৃষক সংগঠন নেই, যেটা খুব জরুরী ছিল। আর কর্পোরেটরা বীজ নিয়ন্ত্রণের কারণে কৃষকের একার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না সে কমিউনিটির সাথে যুক্ত হচ্ছে।

সরকার রাসায়নিক সারে ভর্তুকি দেয়। একজন কৃষকের যদি চারটি গরু থাকে, তাহলে সে যে পরিমাণ জৈব সার পাবে, তার অর্থমূল্য প্রায় ১,৮০,০০০ টাকা। ঐ জৈব সার মাটিতে যে পরিমাণ পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করবে, তা রাসায়নিক সার দিয়ে করতে গেলে ভর্তুকিসহ প্রায় ৯,০০,০০০ টাকা খরচ করতে হবে। তবে সরকার ইতোমধ্যে কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে বা নেওয়া শুরু করেছে। ‘একটি বাড়ি, একটি খামার’, এরকম একটি প্রকল্প। এভাবে যদি প্রতিটি বাড়িতে সমন্বিত চাষাবাদ শুরু করা যায় তাহলে খুব সহজেই জৈব কৃষি বাস্তবায়ন সম্ভব। আমাদের কিছু দীর্ঘমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ নিতে হবে। এখানে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণ লাগবে। ইনটিগ্রেশন ও কোঅর্ডিনেশনও খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত মাটিকে খাওয়ানো, গাছকে খাওয়ানো নয়।

পৃথিবীর বিপর্যয় ঠেকাতে সাবধান হতে হবে এবং বিজ্ঞানকে ইতিবাচকভাবে কাজ লাগানো
জরুরী: হামিদুর রহমান, প্রাক্তন মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

জলবায়ু পরিবর্তন যেহেতু বন্ধ করা সম্ভব নয়, তাই পরিবর্তনের ধারা বা পরিবর্তনের হার কমানোর
বিষয়টিই বিশ্বব্যাপী আলোচনার বিষয়। অন্তত কার্বন নিঃস্বরণের হার কমানো সম্ভব হলেও পৃথিবীতে
আমাদের জীবন-যাপন অনেক সহজ হবে।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য গরীব দেশ থেকে
ধনীদেশগুলোই দায়ী বেশি। মানুষের নিয়তি
হল, মানুষ তার ধ্বংসের সবরকম আয়োজন
নিজেই করে। এমন সব ভুল, এমন সব নিয়ম
এবং এমন সব পরিস্থিতি নিজেই তৈরি করে,
যার জন্য তার পতন অবধারিত হয়। জলবায়ু
পরিবর্তনের সাথে এভাবে মানুষের কৃতকর্মের
যোগ রয়েছে। তবে এ সমস্যা মোকাবেলায়
সচেতনতার কোন বিকল্প নেই। এখানে প্রথম
গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হল সচেতনতা সৃষ্টি করা। এটা
দুইভাবে করতে হবে: জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি
বাড়ায় এমন কার্যক্রম থেকে বিরত থাকা এবং
সেগুলো কমানো; আরেকটি হল, জলবায়ু



হামিদুর রহমান

পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর যে কৌশল সেটার সাথে মানুষকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এই খাপ
খাওয়ানোর কৌশলের সাথে যুক্ত বিজ্ঞানের আবিষ্কার। বিজ্ঞানকে কোনভাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার
সুযোগ নেই। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের কারণেই আমরা আদিম যুগ থেকে আজকে আধুনিক সভ্যতায়
এসেছি। সামনের দিনেও বিজ্ঞানের সহযোগিতাই নিতে হবে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নিরাপদ
খাদ্য, সেই নিরাপদ খাদ্যের কাছে যেতে হলেও বিজ্ঞানের সহায়তা নিতে হবে।

সভাপ্রধানের বক্তব্য ও সমাপ্তি :

ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতির হিসেব এবং সকল কৃষি সম্পর্কিত জ্ঞান কৃষকের কাছে তুলে ধরে তাকে সিদ্ধান্ত
নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে: সুরাইয়া বেগম, রিইব

বাংলাদেশে এক সময় অনেক কৃষক সংগঠন ছিল। ১৯৭৫ এর পরে সামরিক শাসন ব্যবস্থায়, সরকারের
পক্ষ থেকেই এসব সংগঠন পরোক্ষে নষ্ট করে দেওয়া হয়। এছাড়া আগে দেশে ক্ষেতমজুর সংগঠনও
ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আর সেই সংগঠনগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা সম্ভব হয়নি। রিইব সরাসরি
কৃষক সংগঠন না করলেও, কৃষককে বিভিন্ন বিষয় জানানোর কাজটা করছে, কারণ কৃষকের নিজস্ব
মতামতের বাইরে তাকে দিয়ে কোন কাজ করানো সম্ভব নয়। সুতরাং কৃষকের সমস্যা সমাধানের জন্য
কৃষকই হচ্ছে সবচেয়ে ভাল অ্যাক্টর। আর সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তাকে শক্তিশালী করতে, তাদের
অধিকার ও সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তাদের উজ্জীবিত করতে হবে। কৃষক জৈব কৃষি করবে
নাকি রাসায়নিক কৃষি করবে, এ সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার মনোভাব থেকে সরে আসতে হবে। কৃষকের
কাছ থেকেও অনেক কিছু শেখার আছে। রিইব বিভিন্ন ডায়ালগের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান কৃষকের মাঝে
ছড়িয়ে দেয়। রিইব একদিকে যেমন কৃষকের কাছেও যাচ্ছে, মধ্যবর্তী গবেষকদের সাথেও আলোচনা
করছে, আবার সরকারি নীতি-নির্ধারক পর্যায়েও যোগাযোগ করছে। আশা করা যায় যে, একসময়
কৃষকের আর কাউকে দরকার হবে না। তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ
করতে পারবে। সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেই রিইব সহযোগিতা করে যাচ্ছে। এই আলোচনায় অংশ
নেওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আশা করছি এরপরের আলোচনায় আজকের আলোচনার
পুনরাবৃত্তি না করে এখান থেকে আহরিত জ্ঞানকে সঙ্গে নিয়ে আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার
কথাগুলো আলোচনা হবে এবং পরবর্তী করণীয়গুলো আমরা বলতে পারব।

সক্রিয় আলোচকবৃন্দের তালিকা

মনোরঞ্জন মণ্ডল
সিমা দাস শিমু
লাকী আক্তার
জাবেদ হোসাইন
তানভীর শাতিল
মো: মনিরুজ্জামান
মিজানুর রহমান
ফারহানা ফেরদৌস
আবু নাসের অনিক
বিভূতি শিকদার

দেওয়ান আখতারুজ্জামান
এবিএম আনিসুজ্জামান
ড. মজিবুর রহমান
প্রদীপ কুমার রায়
দিজেন মল্লিক
ড. অনিল দাস
নিলুফার হাই করিম
ড. আতিক রহমান

মনিরুল ইসলাম খান
আনু মুহাম্মদ
এম এম আকাশ
ড. মাহফুজুল হক
সাফিয়া আজিজ
পিনাস আক্তার
এবাদুল্লা খান

আমিনুল ইসলাম
দারুল ইসলাম
আনিসুর রহমান
মো: ইফতেখার আলী
আবু তালেব হালিম
কাজী মো: জামিরুল ইসলাম
বাবুল আকন
বিনোদ কণ্ঠি
সুরাইয়া বেগম
ড. লতিফুল বারী

ড. মো. নাজিম উদ্দিন
মো. হামিদুর রহমান
ড. নীলুফার হাই করিম
সাইদুর রহমান

পানি বিজ্ঞানী, আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা
পরিচালক, উবিনিগ
নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ কৃষক সমিতি
অধ্যাপক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
স্টাফ রিসার্চর, গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক
নেটস্ বাংলাদেশ
নিজেরা করি
এএলআরডি
এইড ফাউন্ডেশন
লেকচারার, ইন্সটিটিউট অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড
ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পরিচালক, ফেয়ার, কুষ্টিয়া
প্রকল্প সমন্বয়কারী, নাগরিক উদ্যোগ
অধ্যাপক, আইইউবিএটি
সমন্বয়কারী, সিএসআরএল
রিসার্চ ফেলো, বিসিএএস
ন্যাশনাল কনসালটেন্ট (প্রোগ্রাম), এফএও বাংলাদেশ
কোঅর্ডিনেটর- ডকুমেন্টেশন এ্যান্ড ট্রেনিং, রিইব
এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, বাংলাদেশ সেন্টার অব
এ্যাডভান্সড স্ট্যাডিজ
অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অবসারপ্রাপ্ত সচিব ও ফ্যাকাল্টি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
কৃষি আন্দোলন কর্মী, প্রাকৃতিক কৃষি
অব্রফাম, ঢাকা
সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
এডিটর, দা রিফ্লেক্টর
উন্নয়ন ধারা
কোঅর্ডিনেটর, ওয়েভ ফাউন্ডেশন
অ্যাসিস্টেন্ট প্রোগ্রাম অফিসার, রিইব
দপ্তর সম্পাদক, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন
নির্বাহী পরিচালক, পিজেএস
এসিস্টেন্ট ম্যানেজার, আই আই ডি
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, আরএলএস, দিল্লী অফিস
প্রকল্প সমন্বয়ক এবং উপ-পরিচালক, রিইব
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন
সাইন্সেস-এর ফুড অ্যানালিসিস অ্যান্ড রিসার্চ ল্যাবরেটরি'র হেড
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি
সাবেক মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)
সাবেক পরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)
কনসালট্যান্ট, রিইব



Research Initiatives, Bangladesh (RIB)

Research Initiatives, Bangladesh (RIB) was founded to promote knowledge on poverty alleviation that is relevant, innovative, participatory and action oriented, with a special focus on marginalized and socially excluded communities. RIB views poverty as a multidimensional process and recognizes that the needs of poverty groups go beyond simple income generation, food and shelter, to areas such as equality, dignity, justice, human rights and good governance. RIB supports marginalized and minority groups who are unable to access basic services due to social discrimination and conduct people's research ("Gonogobeshona") on the development schemes that affect them most, in order to develop ownership and generate community mobilization. For more information please visit www.rib-bangladesh.org



Rosa Luxemburg Stiftung

Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) is a political foundation from Germany that works within the tradition of workers' and women's struggles. Bearing the name of Democratic Socialist Rosa Luxemburg (1871-1919), the foundation serves as a forum for debate and critical thinking about political alternatives, as well as a research centre for progressive social development. RLS promotes the discourse among activists, scientists and intellectuals from South Asia and Germany as well as from other regions of the world. A special focus lies on creating networks among countries of the Global South. The foundation also provides space for critical discourse and publishes educational material. For more information please visit www.rosalux.in